গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ লক্ষ্মীপুর

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
আফসানা ইয়াসমীন

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
লক্ষ্মীপুর

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি : ৪ এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েব সাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : লক্ষ্মীপুর

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং আফসানা ইয়াসমীন যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ ও ড. মোঃ লিয়াকত আলী। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া লক্ষ্মীপুর জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে লক্ষ্মীপুর জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনায় তথ্য ভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

এ ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে লক্ষ্মীপুরের উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১. বি. বি. এস., ২০০১। কৃষি শুমারী ১৯৯৬ : জেলা সিরিজ লক্ষ্মীপুর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, জুন ২০০১।

২. বি. বি. এস., ১৯৯৩। আদম শুমারী ১৯৯১ : জেলা সিরিজ লক্ষ্মীপুর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, জুলাই ১৯৯৩।

৩. ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০২।

৪. CEGIS, 2004. Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services. Dhaka, May 2004.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে লক্ষ্মীপুর জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

এ ছাড়াও বইটির বিশেষ পর্যালোচনা ও মূল্যবান তথ্য ও মতামত দিয়েছেন :

- জনাব এ.এন.এম. শামসুদ্দিন দেওয়ান, পরিচালক, জনসেবা কেন্দ্র, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।
- জনাব মোঃ আব্দুল হালিম, থানা ম্যানেজার, এন.আর.ডি.এস অফিস, মান্দারী বাজার, লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা **১-৪**
এক নজরে লক্ষ্মীপুর ২
জেলার অবস্থান ৩
উপজেলা তথ্য সারণী ৪

প্রকৃতি ও পরিবেশ **৫-১২**
প্রাকৃতিক পরিবেশ ৫
কৃষি সম্পদ ৭
নদী-মোহনা ও বিলের মাছ ৮
দুর্যোগ ৯
বিপদাপন্নতা ১২

জীবন ও জীবিকা **১৩-১৭**
জনসংখ্যা ১৩
জনস্বাস্থ্য ১৩
শিক্ষা ১৪
অভিবাসন ১৫
সামাজিক উন্নয়ন ১৫
প্রধান জীবিকা দল ১৫
অর্থনৈতিক অবস্থা ১৬
দারিদ্র্য ১৭

নারীদের অবস্থান **১৯-২০**

অবকাঠামো **২১-২৪**
রাস্তা-ঘাট ২১
পোল্ডার ২১
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ২১
হাট-বাজার ও বন্দর ২১
বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ২২
শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো ২২
সেচ ও গুদাম সুবিধা ২২
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ২৩
উন্নয়ন প্রকল্প ২৩

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা **২৫-৩১**
প্ররিবেশগত সমস্যা ২৫
পরিবেশ দূষণ ২৬
ভূমি বন্দোবস্তের সমম্যা ২৬
কৃষি সমস্যা ২৭
আর্থ-সামাজিক সমস্যা ২৯
যোগাযোগ সমস্যা ৩০
পর্যটন বিষয়ক সমস্যা ৩১

সম্ভাবনা ও সুযোগ **৩৩-৩৬**
কৃষি ও অর্থনীতি ৩৩
প্রাকৃতিক সম্পদ ৩৪
আর্থ-সামাজিক অবস্থা ৩৪
শিল্প ও বাণিজ্য ৩৫
পর্যটন শিল্প ৩৬
যোগাযোগ ব্যবস্থা ৩৬

ভবিষ্যতের রূপরেখা **৩৭**

দর্শনীয় স্থান **৩৯-৪১**

জেলা মানচিত্র

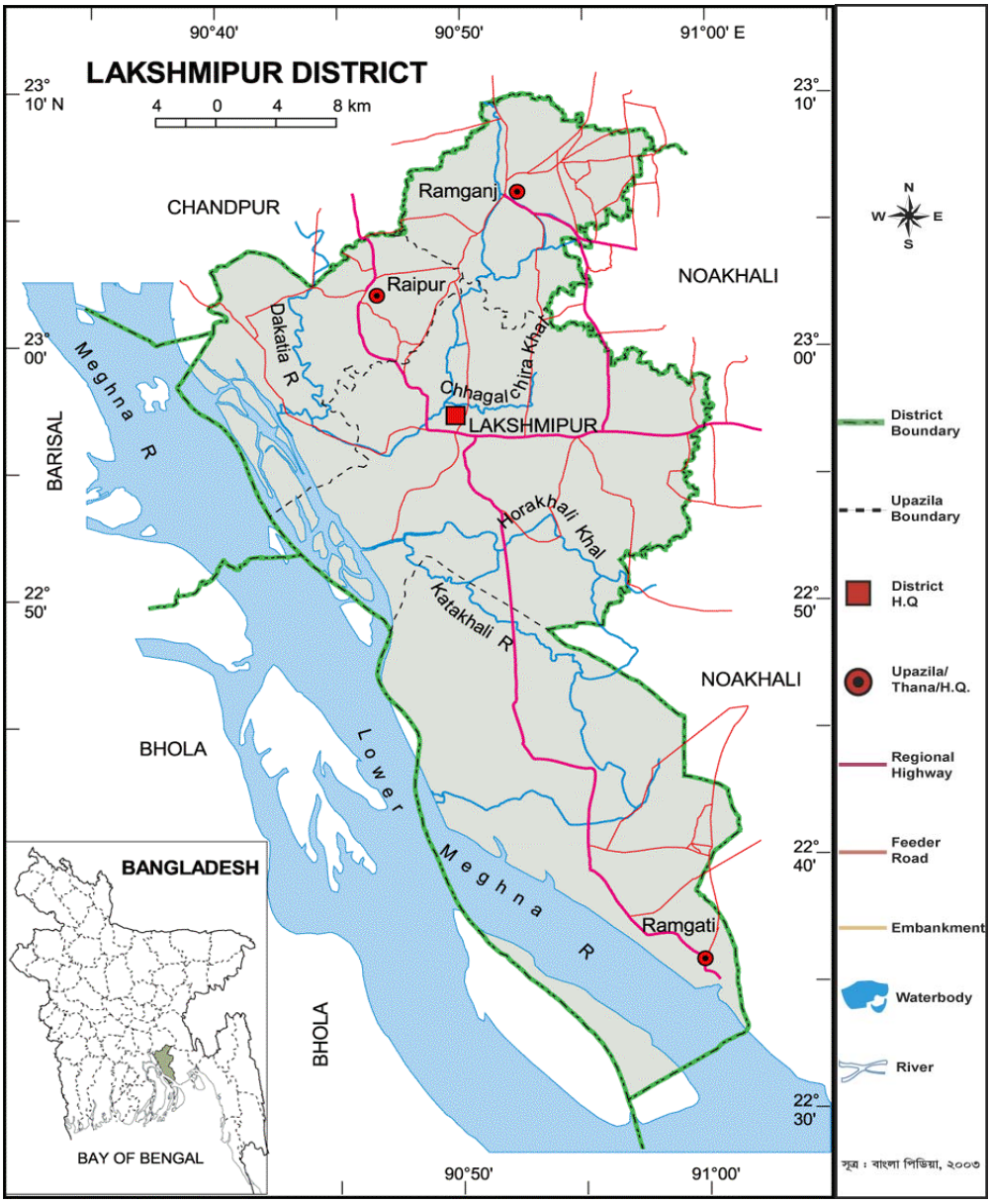

LAKSHMIPUR DISTRICT
4 0 4 8 km
90°40'
90°50'
91°00' E
23° 10' N
23° 00'
22° 50'
22° 40'
22° 30'
CHANDPUR
NOAKHALI
BARISAL
BHOLA
Ramganj
Raipur
LAKSHMIPUR
Ramgati
Dakatia R
Chhagal
chira Khal
Horakhali Khal
Katakhali R
Meghna R
Lower Meghna R
BANGLADESH
BAY OF BENGAL
District Boundary
Upazila Boundary
District H.Q
Upazila/ Thana/H.Q.
Regional Highway
Feeder Road
Embankment
Waterbody
River
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জেলা রহমতখালী নদীর তীরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্গত এই জেলার উত্তরে চাঁদপুর, দক্ষিণে নোয়াখালী ও ভোলা, পূর্বে নোয়াখালী এবং পশ্চিমে বরিশাল জেলা ও মেঘনা নদী। লক্ষ্মীপুর জেলা ১৩শ' শতাব্দীর শুরুতে ভুলুয়া রাজ্যের অংশ ছিল। বলা হয়ে থাকে যে, মোগল ও ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে লক্ষ্মীপুর একটি মিলিটারী আউটপোস্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই এলাকায় প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদন হতো ও রপ্তানী চলত। এ থেকেই এখানে লবণ আন্দোলনের সূত্রপাত। জেলার লোকজনের নীল বিদ্রোহ ও স্বদেশী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী এই এলাকা পরিভ্রমণ করেন এবং রামগঞ্জের শ্রীরামপুর রাজবাড়ী ও কফিলাতলি আখড়াতে অবস্থান করেন। এ ছাড়া ১৯২৬ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এখানে আসেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এখানে ১৭টি বড় ধরনের লড়াই হয়। জেলার বধ্যভূমি, গণকবর, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ আজও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

লক্ষ্মীপুর জেলার নামকরণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক কৈলাশ চন্দ্র সিংহ "রাজমালা" বা "ত্রিপুরার ইতিহাস" বর্ণনায় লিখেন যে, বাঞ্চানগর চাকলা, সমসেরাবাদ মৌজা, লক্ষ্মীপুর মৌজা পাশাপাশি অবস্থিত ছিল, যা থেকে প্রমাণিত হয় বাঞ্চানগর চাকলার মধ্যে লক্ষ্মীপুর নয়, বরং বর্তমানের লক্ষ্মীপুর গ্রাম ও তার কাছাকাছির বিস্তৃত এলাকা নিয়েই লক্ষ্মীপুর মৌজার ব্যাপ্তি ছিল। এ থেকেই লক্ষ্মীপুর নামের উৎপত্তি। আবার কারো মতে, ১৮৬০ সালে সম্রাট শাহ্জাহানের ছেলে শাহ্ সুজা ভূলুয়া দখলের আরাকান রাজ্য হয়ে শ্রীপুরে পৌছান। এরপর লক্ষ্মীদহ্ পরগনা থেকে যাত্রা করেন এবং ভূলুয়া দখলে ব্যর্থ হয়ে আরাকানে ফেরত চলে যান। অর্থাৎ শাহ্ সুজার ভূলুয়া গমনের কাহিনী থেকে লক্ষ্মীদহ পরগনার নাম পাওয়া যায়। ধারণা করা হয়, এই লক্ষ্মীদহ থেকেই লক্ষ্মীপুরের নামকরণ চলে আসে। এ ছাড়া সুরেশ চন্দ্রনাথ মজুমদার তার গবেষণামূলক বই "যোগী বংশ"তে উল্লেখ করেন, দালাল বাজারের জমিদার রাজা গৌরী কিশোর রায় চৌধুরীর বংশধর লক্ষ্মী নারায়ণ রায়ের নামানুসারে জেলার নাম হয়ে যায় লক্ষ্মীপুর। তবে, অনেকের মতে বঙ্গোপসাগর ও মেঘনার মোহনায় অবস্থিত এই জেলা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাসে ব্যাপক গুরুত্ব রাখার কারণে "লক্ষ্মীপুর" নামকরণ করা হয়, যার অর্থ "সৌভাগ্যের নগরী"।

লক্ষ্মীপুর জেলার মোট আয়তন ১,৪৫৬ বর্গ কি. মি. যা, সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের প্রায় ১%। এলাকার বিচারে এটি উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার মধ্যে আয়তনে ১৪তম স্থানে এবং বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৪৬তম স্থানে রয়েছে।

উপজেলা	৪
পৌরসভা	৩
ইউনিয়ন	৫০
ওয়ার্ড	৩০
মৌজা/মহল্লা	৫১৫
গ্রাম	৫৩৭

৪টি উপজেলা, ৩টি পৌরসভা, ৫০টি ইউনিয়ন, ৩০টি ওয়ার্ড, ৫১৫টি মৌজা/মহল্লা ও ৫৩৭টি গ্রাম নিয়ে লক্ষ্মীপুর জেলা। লক্ষ্মীপুর সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ ও রামগতি জেলার ৪টি উপজেলা। ১৮৬০ সালে নোয়াখালী জেলার অধীনে তৎকালীন লক্ষ্মীপুর থানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সালে লক্ষ্মীপুর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৯ সালে এটি উপবিভাগে রূপান্তরিত হয়। এর পরে ১৯৮৪ সালে এটি জেলায় উন্নীত হয়। ১৮৬০ সালে লক্ষ্মীপুর শহর গঠিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়, যা ১২টি ওয়ার্ড ও ২২ টি মহল্লা নিয়ে গঠিত।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের ভূমিভিত্তিক সীমা নির্ধারণের জন্য তিনটি সূচক বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে জোয়ার-ভাটার প্রভাব, লোনা পানির অনুপ্রবেশ এবং ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছ্বাস। এর ভিত্তিতে লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি তীরবর্তী (Exposed Coast) এবং সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ উপজেলাকে অন্তর্বর্তী উপকূলীয় (Interior Coast) এলাকায় পড়েছে।

এক নজরে লক্ষ্মীপুর

	বিষয়	একক	লক্ষ্মীপুর	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১,৪৫৬	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৪	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৫০	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	৩০	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৫১৫	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৫৩৭	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৪.৮৬	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৭.৪৫	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৭.৪১	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	১,০২১	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০০.৫	১০৪.৭	১০৬.৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৫.২	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.৮৭	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৪.৫১	৩.৪৪	৩.৫০	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৫	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬০	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৪	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৫	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৭৫	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	৬৬	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	২,৪৮৭	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৫,৫১৮	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর+)	হাজার	৪৯২	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	২৩	২৬	২৮	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩৫	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১৫	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৬	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৭২	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৩৯	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৩	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ৭ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৪৩	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৪৫	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪১	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার, ১৫ বছর+	মোট জনসংখ্যা (%)	৪৭	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৫১	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৪৪	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	১১১	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮৭	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৯	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালের শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/শয্যা	১০,৯৩৬	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৬১	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৯৫	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৭	৬	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৭	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৭	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৩	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৩২	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পেটি, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- জেলার ক্ষুদ্র কৃষকদের সংখ্যা ৬৮%, যা জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার মোট আয়তনের মাত্র ৩% প্রত্যন্ত এলাকা বা দ্বীপাঞ্চল।
- জেলার ৪৬% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় হারের (৩৭%) তুলনায় বেশি ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪৬%) সমান।
- জেলার গড়ে প্রতি ৬৬ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র রয়েছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় সুবিধাজনক ।
- রাস্তার ঘনত্ব ০.৭৫ কি.মি./বর্গ কি.মি., যা জাতীয় (০.৭২কি.মি./বর্গ কি.মি.)-র তুলনায় বেশি ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি.মি./ বর্গ কি.মি.) ।
- মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩ জন, যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম ।
- জেলায় ১৫-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে ২৩% খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে কর্মরত, যা জাতীয় (২৮%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৬%) এর তুলনায় কম।
- মাঝারি মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে জেলার অবস্থান (বি.বি.এস., ক্রমানুসারে) ১৩তম স্থানে।
- লক্ষ্মীপুর জেলার মাথাপিছু আয় ১৫,৫৫৮ টাকা, জাতীয় আয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) তুলনায় কম ।
- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার ৪.৮%, জাতীয় হার (৫.৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (৫.৪%) চেয়ে কম ।
- মোট আয়ে শিল্প খাতের অবদান ১৩%, জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২২%) হারের তুলনায় কম।
- জেলার দারিদ্র্য পীড়িত ও অতিদরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা যথাক্রমে ৭৩% ও ৩৯%, জাতীয় (৪৯% ও ২৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫২% ও ২৪%) তুলনায় বেশি।
- জেলার মোট গৃহের ৮৭% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় হার (৯১) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮৮%) তুলনায় কম।
- জেলার মোট বিদ্যুৎ সংযোগের পরিমাণ ২৪%, জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার ভূমিহীনদের সংখ্যা ৫৬%, যা জাতীয় (৫৩%) ও সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৪%) তুলনায় বেশি।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬১ জন, যা জাতীয় (৪৩ জন) হারের তুলনায় অনেক বেশি এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের বিবেচনায় প্রায় সমান (৫১-৬৮ জন)।
- সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর) মাত্র ৪৩%, যা জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) হারের তুলনায় কম ।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ১০,৯৩৬ জন, যা জাতীয় দশা (৪,২৭৬ জন) এবং সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের (৪,৬৩৭ জন)তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩২%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যা ১৫%, যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলায় রেল সংযোগ নেই।
- জেলায় কোন নৌ বন্দর নেই।
- খনিজ সম্পদ নেই।
- নিম্ন মাত্রার পর্যটন আকর্ষণ।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	লক্ষ্মীপুর	উপজেলা				তথ্য সূত্র ও বছর
				সদর	রায়পুর	রামগঞ্জ	রামগতি	
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	১,৪৫৬	৫১৫	২০১	১৬৯	৫৭১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	৮০	৩০	১৯	১৯	১২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৫১৫	২৫৫	৬৯	১৩৭	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	৫৩৭	২৫৪	৮১	১৩৩	৬৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৪.৮৫	৫.৭১	২.৩৬	২.৮৪	৩.৯৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৭.৪৫	২.৮০	১.২০	১.৪২	২.০১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৭.৪১	২.৯০	১.১৫	১.৪২	১.৯২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	১,০২১	১,১১১	১,১৭৬	১,৬৮০	৬৮৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০১	৯৭	১০৪	১০০	১০৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	২.৮৭	১.১৫	০.৪৬	০.৫৩	০.৭৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৫.২০	৪.৪৭	৫.০৮	৫.৩৭	৫.৩৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	৪.৫১	২.৯	৩.০	৩.৩	১.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৫	২৫	৩২	৩১	১৭	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬০	৬৫	৬৮	৮৯	৬০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৩.১৪	৩.৬৩	৩.৩৩	৪.১৯	১.৪৩	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	৭০২	২১৫	১৮৬	১৭৩	১২৮	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৫৯	৭৬	২৩	৩৩	২৭	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২০	৮	২	৫	৫	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩৫	২৯	৩৩	১৯	৩৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৭৭	৭৫	৭৪	৮১	৭২	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	২৩	২৫	২৬	১৯	২৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	৭৩,৭০৫	২৫,৮৪৮	৯,৩২৯	৯,১৩৮	২৯,৩৯০	২০০৩,(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	২৬	১৭	৮	৫৫	২৩	২০০৩,(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৫৯	৬৮	৮০	৩৩	৫৫	২০০৩,(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	১৫	১৫	১২	১২	২২	২০০৩,(বাংলা পিডিয়া, ২০০৩)
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	১৪,৪৭০	১৫,০০০	১৯,০০০	১৪,০০০	৯,৮৮০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর+)	মোট জনসংখ্যা (%)	৪৩	৪৬	৪৩	৫৪	২৯	২০০১(প্রা.শি.অ., ২০০৩)
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৩	৭১	৯৯	১০৬	১১১	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	১০৬	৯২	১১৯	১০৭	১১১	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১৩,৩০৭	৫,১৫৮	২,০৯৯	৩,১৯৮	২,৮২৫	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৭২	৭৬	৬৫	৯২	৫৯	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৬	৭	৪	১১	৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

"সৌভাগ্যের নগরী" হিসেবে পরিচিত লক্ষ্মীপুর জেলার সেই ঐতিহ্য এখন আর নেই। তারপরও ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ-প্রতিবেশ, নদী ও মোহনা, চরাঞ্চল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মিলিয়ে লক্ষ্মীপুর জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

নদী ও মোহনা : মেঘনা-ডাকাতিয়া, কাটাখালি, রহমতখালী, ভুলুয়া ও জরিরদোনা জেলার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদী। প্রশস্ততম মেঘনা নদী লক্ষ্মীপুর জেলাকে বৃহত্তর বরিশাল জেলা থেকে পৃথক করেছে। জেলায় মোট ১১৮ বর্গ কি.মি. নদীপথ আছে। এই নদী পথ জেলার মোট আয়তনের ২৩%।

ডাকাতিয়া : প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে উৎসারিত হয়ে পাহাড়ী এই নদীটি কুমিল্লার বাগছড়া দিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করেছে। আন্তঃসীমান্ত এই নদীটি ২০৭ কি.মি. দীর্ঘ। ডাকাতিয়া নদী মূলত সোনাইছড়ি, পাগলি বোয়ালজার ও কাঁকড়ি নামের পাহাড়ি নদীর মিলিত স্রোত। নদীটি উজানে ছোট ফেনী নদী দ্বারা বিভক্ত এবং এটির প্রধান স্রোত চৌদ্দগ্রাম খাল দিয়ে আবার ফেনী নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে। দক্ষিণে এর শাখা নোয়াখালী খাল গঠন করেছে এবং পশ্চিমে শেখেরহাটের কাছ থেকে দক্ষিণে রায়পুরের কাছে মেঘনায় মিলেছে। এই স্থানেই ডাকাতিয়ার নতুন ও তীব্র স্রোতধারা চাঁদপুর খাল দিয়ে মেঘনায় গিয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, প্রায় সারা বছর ধরে মেঘনা নদী থেকে ডাকাতিয়ায় জোয়ার-ভাটার স্রোত প্রবাহিত হয়।

মেঘনা : মেঘনা নদী অত্যন্ত গভীর, নাব্য ও সারা বছর ধরে নৌ চলাচলের উপযোগী। এই নদীর উপর লক্ষ্মীপুরের জনজীবন, সেচ ও কৃষিসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনেকাংশেই নির্ভরশীল। নদীটি হাওড়, পাহাড়িয়া নদী ও পদ্মা-যমুনার মিলিত স্রোত এবং প্রতি বছর বর্ষায় মেঘনা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবন সৃষ্টি করে।

প্রধান নদী	**মেঘনা-ডাকাতিয়া, কাটাখালি, রহমতখালী, ভুলুয়া ও জরিরদোনা**
নদীর দৈর্ঘ্য	**১১৮ বর্গ কি.মি.**
উৎপত্তি স্থান	**উজানের নদী, ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি অঞ্চল**

খাল ও নালা : লক্ষ্মীপুর জেলায় রয়েছে উল্লেখযোগ্য কয়টি খাল ও নালা। এর মধ্যে ভুলুয়ার খাল উল্লেখযোগ্য। জেলার রামগতি উপজেলা ও নোয়াখালী জেলার সুধারাম উপজেলার সীমান্তবর্তী ভুলুয়া খালটি রামগতির চর কাদিরা ইউনিয়ন থেকে চর জগবন্দু, বাংলাবাজার, কেরামতিয়া, হারুন বাজার, বান্দের হাট, চৌধুরীর হাট, তাহের মার্কেট পর্যন্ত ৫০ কি.মি. অতিক্রম করে বয়ার চরের মধ্য দিয়ে রামগতি বাজারের দক্ষিণে মেঘনা নদীতে গিয়ে পড়েছে। এই ভুলুয়া নদী স্থানীয়ভাবে বাগ্গা নদী নামে পরিচিত। ১৯৫৪ সালে এটি মেঘনার একটি শাখা নদী ছিল এবং নোয়াখালীর ভুলুয়া স্টেটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হতো বলে ভুলুয়া নদী নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫৪ সালে লক্ষ্মীপুরের বড়ইবালা পয়েন্টে কমরেড তোহা একটি বাঁধ নির্মাণ করেন, যা বর্তমানে তোহা

বাঁধ নামে পরিচিত। এই বাঁধের কারণে লক্ষ্মীপুর, রামগতি ও সুধারামের প্রায় পাঁচ হাজার বর্গ কি.মি. এলাকায় চর পড়ে যায় এবং ভুলুয়া নদী পলি পড়ে ভুলুয়া খালে পরিণত হয়।

চরাঞ্চল	চর আলেকজান্ডার, চর, আলগি, চর ফলকন, চর গাজী, চর কালকিনি, জালিয়ার চর এবং পাতার চর
মোট আয়তন	২১৫ বর্গ কি.মি.
পেশা	বর্গা চাষ, মাছ ধরা, দিন মজুরি, নৌকা চালানো
দুর্যোগ	নদী ভাঙন ও নতুন জমি জেগে ওঠা, স্বল্পসংখ্যক সাইক্লোন সেন্টার, ঋতুগত অভিবাসন, জনসংখ্যার ঘনত্ব
সম্ভাবনা	মাছ ধরা, কৃষি, গো-চারণভূমি ও ম্যানগ্রোভ বন

চরাঞ্চল : লক্ষ্মীপুর জেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মূল ভূ-খণ্ডের সাথে সংযুক্ত চরাঞ্চল। চর আলেকজাণ্ডার, চর আলগি, চর ফলকন, চর গাজী, চর কালকিনি, জালিয়ার চর এবং পাতার চর ইত্যাদি জেলার প্রধান কয়েকটি ছোট বড় উল্লেখযোগ্য চর। এই চরগুলোর মোট আয়তন প্রায় ২১৫ বর্গ কি.মি., যা জেলার মোট আয়তনের প্রায় ১৫%। এর মধ্যে চর গাজী (৫২ বর্গ কি.মি) আয়তনে সবচেয়ে বড় এবং পাতার চর (৯ বর্গ কি.মি) সবচেয়ে ছোট চর।

নদী ভাঙন ও নতুন জমি জেগে ওঠা এই চরাঞ্চলের প্রধান দুর্যোগ। এ ছাড়াও ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যা, যেমন স্বল্পসংখ্যক ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, মৌসুমী অভিবাসন, জনসংখ্যার ঘনত্ব অন্যান্য প্রধান কয়টি আর্থ-সামাজিক সমস্যা। বর্গা চাষ, মাছ ধরা, দিন মজুরি, নৌকা চালানো চরাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রধান পেশা। চরাঞ্চলের অন্যতম সম্ভাবনাময় দিক হল মেঘনা নদীতে মাছ ধরা, কৃষি, গো-চারণভূমি ও ম্যানগ্রোভ বন।

নদী বিধৌত দ্বীপাঞ্চল : রামগতি উপজেলার আব্দুল্লাহ্ ইউনিয়নের বিচ্ছিন্ন দুটি দ্বীপ চর আবদুল্লাহ ও চর গজারিয়া জেলার প্রধান দুটি নদীবিধৌত চর। দ্বীপ দুটোর মোট আয়তন প্রায় ৫০ বর্গ কি.মি., যা লক্ষ্মীপুর জেলার মোট আয়তনের প্রায় ৩.৪%। দ্বীপ দুটোর চারদিকে কোন প্রতিরক্ষা বাঁধ নেই। দ্বীপাঞ্চলের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং নানা ধরনের ফসল ফলানোর উপযোগী। বর্গা চাষ, মাছ ধরা ও নৌকা চালানো এখানকার অধিবাসীদের প্রধান পেশা। দ্বীপাঞ্চলের অন্যতম সম্ভাবনাময় দিক হল উন্মুক্ত জলাশয়, ফসলের মাঠ ও গো-চারণভূমি। নৌকা, ট্রলার প্রধান যানবাহন। দুর্যোগ বলতে সাইক্লোন ও পূর্ণিমায় ভরা জোয়ারই প্রধান। কেননা এতে দ্বীপের অধিকাংশ এলাকা ডুবে যায়।

প্রধান দ্বীপ	চর গজারিয়া, চর আবদুল্লাহ
উপজেলা	রামগতি
আয়তন	৫০ বর্গ কি.মি.
মোট আয়তন	৩.৪%
প্রধান বৈশিষ্ট্য	বিচ্ছিন্ন ও বাঁধের অনুপস্থিতি
প্রধান পেশা	দিন মজুরি, মাছ ধরা
প্রধান সম্পদ	উর্বর জমি, গো-চারণ ভূমি ও উন্মুক্ত জলাশয়
প্রধান দুর্যোগ	ভরা জোয়ার, প্লাবন, সাইক্লোন

পুকুর : জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুকুর। যার মোট এলাকা ৫,৩৯৮ হেক্টর। এর মধ্যে মাছ চাষ করা হয় ৩,৯৪৬ হেক্টর পুকুরে। জেলার পরিত্যক্ত পুকুরের পরিমাণ ৪২১ হেক্টর।

মোট পুকুরের পরিমাণ	৫,৩৯৮ হে.
মাছ চাষের পুকুর	৩,৯৪৬ হে.
মাছ চাষযোগ্য পুকুর	১,০৩১ হে.
পরিত্যক্ত পুকুর	৪২১ হে.

মাটি : লক্ষ্মীপুর জেলা এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন (AEZ) ১৬, ১৭, ১৮ অর্থাৎ নিম্ন মেঘনার প্লাবণভূমি, নতুন মেঘনা মোহনার চারণভূমি ও পুরান মেঘনা মোহনার প্লাবণভূমিতে অবস্থিত। লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন জায়গার মাটি বিভিন্ন ধরনের। জেলার মাটির ধরন সাধারণত উর্বর পলিময় এবং এতে কম বেশি বালু ও কাঁদার পরিমাণও রয়েছে। মেঘনা মোহনার নদীপ্লাবন ভূমির নিম্নাংশে এই

ধরনের মাটি রয়েছে। দক্ষিণের মাটি কিছুটা লবণাক্ত। তবে উত্তরে পুরান মেঘনা মোহনার নদীপ্লাবন এলাকায় খয়েরী বর্ণের মাটি দেখা যায়।

বনভূমি : জেলার মোট বনভূমির পরিমাণ ১৩,৭২৫ হেক্টর (বি.বি.এস., ২০০১)। রামগতি শহরের কাছাকাছি প্রতিরক্ষা বাঁধ দ্বারা সংরক্ষিত চর গাজীতে ম্যানগ্রোভ বন রয়েছে। যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই বন সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি।

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য : বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী লক্ষ্মীপুর জেলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল দক্ষিণে নতুন জেগে ওঠা চরাঞ্চল। এখানে সরকারের সংগঠিত বনায়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নেই। তার পরও লক্ষ্মীপুরের বাড়িঘরগুলো ঘন ও নিবিড় সবুজ গাছ-গাছালিপুর্ণ। কৃষি জমিতে নানা ধরনের ফসল যেমন, স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল (উফশি) ধান, পাট, সবজি, মশলা, ডাল, তৈলবীজ ইত্যাদি ফলানো হয়। ঘরের আঙিনায় ফলজ গাছের সংখ্যাই বেশি। এখানে প্রচুর আম গাছ দেখা যায়, যদিও ফল ততটা উন্নত জাতের নয়। এ ছাড়াও গাব, জাম, খেজুর, তাল, তেঁতুল, কাঁঠাল, জলপাই, বেল, চালতা, বড়ই বা কুল, পেয়ারা, কলা গাছ প্রায় সব জায়গাতেই চোখে পড়ে। কিন্তু এ সব ফল ততটা উৎকৃষ্টমানের নয়। বনজ বা কাষ্ঠল গাছের মধ্যে কড়ই, শাল কড়ই, গর্জন, জারুল, শিমূল গাছই প্রধান। এ ছাড়া সামাজিক বনায়ন ও রাস্তার দু'ধারের গাছের মধ্যে টিক, মেহগনি ও শিশু প্রধান। মান্দার নামের এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ জ্বালানি ও বেড়া দেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া শিমূল, কদম ও কার্পাস গাছও প্রচুর পরিমাণে জন্মে। উল্লেখ্য, শিমূল ও কদম গাছ দেয়াশলাই তৈরিতে এবং শিমূল ও কার্পাস ম্যাট্রেস বা গদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তবে বর্তমানে জেলায় ইউক্যালিপটাস ও পাইন গাছ লাগান শুরু হয়েছে। তেঁতুল ও বড়ই গাছের কাঠ ঘরবাড়ী ও শক্ত আসবাবপত্র তৈরিতে এবং জারুল গাছ ঘরের খুঁটি/স্তম্ভ ও নৌকা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	**ফলজ ও বনজ গাছ, ছায়াতক, তাল, সুপারি আর খেজুর গাছ**
প্রাণী বৈচিত্র্য	**শিয়াল, বাগদাস, উদ, কাঠবিড়ালী, বেজি, নানা প্রজাতির বাদুর , ইঁদুর ও জলাভূমির পাখ-পাখালী**

জেলায় তাল গাছের সারির অপরূপ দৃশ্য উল্লেখ করার মত। জেলার উত্তর থেকে পশ্চিমে যেতে সুপারি গাছের ঘন সারি চোখে পড়ে। তাল, সুপারি আর খেজুর গাছ জেলার উদ্ভিদ বৈচিত্র্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ছায়া বৃক্ষ হিসেবে বট, পিপল, নিম গাছই প্রধান। এখানে প্রচুর বাঁশ ও বেত জন্মে, যা থেকে ঘরের চাল, বেড়া, ঝুড়ি ও মাদুর ইত্যাদি তৈরি হয়।

বনাঞ্চল ও উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাবের কারণে জেলার জীববৈচিত্র্য ততটা সমৃদ্ধ নয়। আর তাই শিয়াল, বাগদাস, উদ, কাঠবিড়ালী, বেজি, নানা প্রজাতির বাদুর ও ইঁদুরই প্রধান প্রাণী হিসেবে বিবেচিত। সরীসৃপের মধ্যে টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ এবং উভচর প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ, গেছো ব্যাঙ উল্লেখযোগ্য। গ্রামাঞ্চলে এখনো লুপ্তপ্রায় সজারু ও গুইসাপ দেখা যায়।

তবে লক্ষ্মীপুরের জীববৈচিত্র্যে বিশেষ মাত্রাযোগ করেছে জলাভূমির পাখ-পাখালী। এদের মধ্যে অন্যতম হল কানি বক, কালা বক, গো বক, মাছরাঙা, হাঁস, রাজহাঁস, পিতাইল, পানকৌড়ি, ডাহুক ও কোড়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও রয়েছে চিল, শকুন, বাজপাখিসহ নানা সাধারণ প্রজাতির পাখি। তবে জেলায় নানা ধরনের গান গাওয়া পাখি দেখা যায়। যেমন কোকিল, হলদে পাখি, ফিঙে, ময়না, শালিক, টুনটুনি, বুলবুলি, শ্যামা ও বাবুই ইত্যাদি।

জলবায়ু : লক্ষ্মীপুর জেলার জলবায়ু গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। জেলার আবহাওয়া মৃদু উষ্ণ এবং আর্দ্রতা সম্পন্ন। এপ্রিল থেকে মধ্য জুন মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল এবং জুনের শেষার্ধে এখানে মৌসুমী বৃষ্টিপাত শুরু হয় এবং অক্টোবরের মধ্য পর্যন্ত তা বজায় থাকে। শীতকাল অত্যন্ত শুষ্ক এবং নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির শেষ সময় জুড়ে শীতকাল। শীতকালের সর্বোচ্চ

ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৭° সে. ও ১২° সে.। কিন্তু গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকে ৩৩° সে. ও ২৫.৫° সে.। জেলায় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,৭০০ মি.মি.।

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : জেলার মোট কৃষি জমির পরিমাণ ৭৩,৭০৫ হেক্টর (কৃষি অধিদপ্তর, ২০০১)। এর মধ্যে ২৬% জমিতে সেচ দেয়া হয়। ভূ-উপরিস্থ পানির সাহায্যে সেচ দেয়া হয় ২২% জমিতে এবং ৪% জমি সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীল। এখানে শস্য নিবিড়তা (Cropping intensity) ২০৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (১৯৯৬) হিসেব অনুযায়ী জেলার মোট ২৪% জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান চাষ করা হয়।

কৃষি জমি	৭৩,৭০৫ হে.
বনাঞ্চল	১৩,৭২৫ হে.
শস্য নিবিড়তা	২০৩

প্রধান ফসল : লক্ষ্মীপুর জেলার অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। লক্ষ্মীপুরের মাটি, জলবায়ু ও পানি নানা ধরনের ফসল উৎপাদনের উপযোগী। জেলার মোট গৃহস্থালির ৭৫%-ই কোন না কোনভাবে ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত। ধান, গম, সরিষা, পাট, মরিচ, আলু, ডাল, ভূট্টা, সয়াবিন, বাদাম, আখ প্রধান ফসল। একসময় লক্ষ্মীপুরে প্রচুর পরিমাণে তিল, কাউন, মেথী, জোয়ার, ছোলা, খেসারী, বার্লি, অড়হর, গম ও তামাকের চাষ হতো, যা বর্তমানে প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। স্থানীয় ও উচ্চ ফসলশীল জাতের ধান, গম, সবজি, মশলা, ডাল জেলার প্রধান অর্থকরী ফসল। এই জেলা নারিকেল ও সুপারি উৎপাদনের জন্য ও বিখ্যাত। তাই প্রধান রপ্তানী ফসল ও পন্যদ্রব্য বলতে নারিকেল, সুপারি, মরিচ, বাদাম, মাছ ইত্যাদি প্রধান। জেলায় প্রচুর পরিমানে ফলজ গাছ দেখা যায়। আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, নারিকেল, সুপারি, বেল, শরিফা ও আমড়া প্রধান কয়টি স্থানীয় ফল। এ ছাড়াও এখানে প্রচুর পরিমাণে কলা, পেয়ারা ও জলপাই উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য, এই জেলায় অকৃষিখাতে কাজ কর্মের হার খুবই কম। আসবাবপত্র তৈরি, পাইকারি বা খুচরা ব্যবসা, হোটেল-রেস্টুরেন্ট ব্যবসা, অর্থায়ন, ইন্সুরেন্স, গৃহায়ন ও ব্যবসা সেবাই অন্যতম।

প্রধান অর্থকরী ফসল	স্থানীয় ও উচ্চ ফসলশীল জাতের ধান, গম, সবজি, মশলা, ডাল
প্রধান রপ্তানী ফসল	মরিচ, বাদাম, মাছ, নরিকেল, সুপারি

এলাকার জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা না থাকায় বহু জমিই অব্যবহৃত, অতি ব্যবহৃত বা ভুল ব্যবহার হচ্ছে। ফলে কৃষকের অর্থ ও শ্রম - এই দু'য়েরই ক্ষতি হচ্ছে। জেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সমন্বিত কীট-পতঙ্গ ব্যবস্থাপনা বা Integrated Pest Management (IPM) ব্যাপক প্রচলন শুরু করা প্রয়োজন। কেননা কৃষকদের অজ্ঞতা, অসচেতনতা আর তথ্যের অভাবে প্রতি বছর এই জেলায় বিপুল পরিমাণ ফসল বিনষ্ট হয়। IPM এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

নদী-মোহনা ও বিলের মাছ : লক্ষ্মীপুর জেলা মাছের দিক থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইলিশের জন্য এ জেলা বিখ্যাত। কৃষি ক্ষেত্রে জেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাছের প্রাচুর্য্য। কেননা, এখানে লোনা ও মিঠাপানির মাছ দুই-ই পাওয়া যায়। নদী-নালা, খাঁড়ি ও ধানক্ষেত থেকে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে নানা প্রজাতির মাছ ধরা হয়। লক্ষ্মীপুরের জনগণের প্রধান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি হল মাছ ধরা। কার্প, রুই, কাতল, মৃগেল, কালী বাউশ, আইর, টেংরা, মাগুর,

জলাভূমি	মে. টন
নদী-মোহনা	১৮,২৩৪ মে.টন
বন্যাপ্লাবন ভূমি	৪,৪৫৪ মে.টন
মোট	২২,৬৮৮ মে.টন

শিং, কই, পাবদা প্রধান কয়টি মিঠা পানির মাছ। এ ছাড়াও রয়েছে চিংড়ি, কুচো চিংড়ি, কাঁকড়া, মৌরালা, পুঁটি, খোলশে, বাইন ও চেলা মাছ। বর্তমানে জেলার অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে কার্প, সিলভার কার্প, তেলাপিয়া, নাইলোটিকার চাষ ব্যাপকভাবে করা হচ্ছে।

২০০১-২০০২ সালে জেলায় মোট ২২,৬৮৮ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয় এবং তা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল (২,৫১,৯৯৯ মে.টন) এবং বাংলাদেশ (৬,৮৫,০৮০ মে.টন) এর পরিমাণের তুলনায় যথাক্রমে ৯% এবং ৩% (মৎস্য অধিদপ্তর, ২০০৩)। উল্লেখ্য, নদী- মোহনায় ১৮,২৩৪ মে.টন ও বন্যাপ্লাবন ভূমি এলাকায় ৪,৪৫৪ মে.টন মাছ ধরা হয়।

তবে, সম্প্রতি সংবাদ পত্রে (জুন, ২০০৪) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জেলার মাছের চাহিদা বছরে ৫০,০০০ মেট্রিক টন। অথচ বিগত ২০০৩ সালে মাত্র ২৬,০০০ মে.টন মাছ উৎপাদিত হয়। কেননা বর্তমানে জেলার প্রতি হেক্টর পুকুরে মাত্র ১,৫০০ কেজি মাছ উৎপাদিত হয়। এর বাইরে মেঘনা নদী থেকে ইলিশসহ মোট ১৭,০০০ মে.টন মাছ ধরা হয়। মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর ৭,০০০ হেক্টর এলাকা এবং জেলার ৭০টি নালার আয়তন ৯০০ হেক্টর। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুকুর ও উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছ স্থানীয় চাহিদা পুরনের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত।

চিংড়ি : এলাকায় চিংড়ি চাষের বিস্তার শুরু হয়েছে। জেলায় মোট হ্যাচারী সংখ্যা ২১টি। এর মধ্যে দুটো সরকারি, ১৮টি ব্যক্তিগত ও ১টি DANIDA-র সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জেলায় চিংড়ি চাষের তথ্য বিশ্লেষণে জানা যায় যে, বর্তমানে লক্ষ্মীপুরে চিংড়ি চাষ ও ধানক্ষেতে মাছ চাষ দুটোই ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সম্প্রতি এখানে চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষের প্রচলন শুরু হয়েছে।

সাল	চিংড়ি ঘের (গলদা ও বাগদা)	উৎপাদন
১৯৯৬-৯৭	৫ হে.	১ মে.টন
২০০০-২০০১	৫ হে.	১ মে.টন

মৎস্য অধিদপ্তরের (২০০৩) হিসেব অনুযায়ী গত ২০০০-২০০১ সালে জেলায় মোট ৫ হে.চিংড়ি ঘের (গলদা ও বাগদা) থেকে মোট ১ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য, বিগত ১৯৯৬-৯৭ সালে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫ হে. এবং তা থেকে প্রায় ১ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। এই হিসেবে দেখা যায় লক্ষ্মীপুরে চিংড়ি চাষের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ একেবারেই বাড়েনি। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২), বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (২০০৩) এবং পেশাজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেলার মাছ চাষীদের অজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের অভাব, বিনিয়োগের অভাব, অপর্যাপ্ত চিংড়ি পোনা পরিচর্যা ইত্যাদি কারণে জেলার চিংড়ি উৎপাদন অপরিবর্তিত থেকে যাচ্ছে।

পশু সম্পদ : কৃষি শুমারি ১৯৯৬ অনুসারে লক্ষ্মীপুর জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ২,৩৭,৭১৬টি গৃহে গবাদিপশু রয়েছে, যা মোট গ্রামীণ গৃহস্থালির ৩৬% এবং গৃহস্থালিগুলোর মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ১,৮০,৬২৯। অর্থাৎ প্রতিটি ঘরে গড়ে ২.১টি করে গবাদিপশু আছে। এ ছাড়া গ্রামীণ গৃহস্থের মোট হাঁস-মুরগির সংখ্যা ২০,৩৯,৭৬১ এবং ঘর প্রতি গড়ে ৯টি করে হাঁস-মুরগি আছে। এ ছাড়া জেলায় মোট ১০২টি পশু সম্পদ খামার এবং ২২২টি হাঁস-মুরগি খামার রয়েছে ।

মোট গবাদিপশু র সংখ্যা	২,৩৭,৭১৬টি
ঘর প্রতি গবাদিপশু (গড়)	২.১টি
মোট হাঁস-মুরগি র সংখ্যা	২০,৩৯,৭৬১টি
ঘর প্রতি হাঁস-মুরগি (গড়)	৯টি

দুর্যোগ

লক্ষ্মীপুর জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। নদী ভাঙন, নদী ভরাট, আর্সেনিক দূষণ, জলাবদ্ধতা, পানি-মাটির লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা জেলার প্রধান কয়টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ ছাড়াও মানুষের কাজকর্ম, অসচেতনতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা বা দুর্যোগ তো রয়েছেই।

নদী ভাঙন : জেলার উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ নদী ভাঙন। জেলার নদীগুলো আজ দ্রুত ও ধীরগতির ভাঙনের শিকার। মেঘনা নদী ভয়াবহভাবে ভাঙছে। ইতিমধ্যেই রামগতি উপজেলার মাটিরহাট বাজারের অধিকাংশ এলাকাসহ প্রায় ৩ কি.মি. এলাকা মেঘনার ভয়াবহ ভাঙন ও জলোচ্ছ্বাসের কবলে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চলতি বর্ষা মৌসুমের অব্যাহত ভাঙন মাটির হাট বাজারের ঘরবাড়ী, বরফ কল, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, মাটির হাট উচ্চ বিদ্যালয় ভেঙে পড়ায় প্রায় হাজার খানেক লোক গৃহহীন হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয়, ব্যক্তিখাতের ২০০ মাছের খামার প্লাবিত হয়েছে।

এ ছাড়া সদর উপজেলার রহমতখালী নদীর ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নদীটি পুনঃখনন না করার কারণে লক্ষ্মীপুরের পূর্বাঞ্চল, চৌমুহনী ও নোয়াখালী অঞ্চলের পানির চাপে মেঘনার এই শাখা নদীটির আশপাশ ভেঙ্গে যেতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার লাহারকান্দি ইউনিয়নের চাঁদখালী গ্রাম, চাঁদখালী হাই স্কুল, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্থানীয় বাজার ও মসজিদটি ভাঙনের কবলে পড়েছে। এ ছাড়াও দিখুলী ইউনিয়নের পূর্ব জামিরতলী হাজী বাড়ীর সামনের ব্যাপক অংশে, বাড়ীঘর, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পিয়ারপুর বাজারের অধিকাংশ এলাকা ভাঙনের মুখে রয়েছে।

নদী ভরাট : অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও নদী শাসন ব্যবস্থা এবং জটিল পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে জেলার নদ-নদীগুলোতে পলি পড়ে অকালে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে জেলার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী লবণাক্ততা, নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারিয়ে অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং শহর, গ্রাম, জনপদের মানুষকে বিপদাপন্ন করে তুলছে।

জলাবদ্ধতা : জেলার নগর ও গ্রামাঞ্চলের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল জলাবদ্ধতা। জেলার পুরোভাগই আজ আঞ্চলিক ও স্থানীয় এই দুই ধরনের জলাবদ্ধতার শিকার। নদী-নালা, খাল-বিল পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীর ভাটিতে পানি প্রবাহ কমে যাওয়া, অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, রেল-সড়ক-মহাসড়ক, পোল্ডার নির্মাণ, অপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও অবকাঠামো সর্বোপরি দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা জলাবদ্ধতাকে তীব্র করে তুলছে। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অপরিকল্পিত মাছের ঘের, নদী-খালে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ, কচুরিপানা, পুকুর-খাল মজে যাওয়া, নদী-শাখা নদীতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের অলিখিতভাবে ইজারা নিয়ে ভোগ দখল ইত্যাদির কারণে জলাবদ্ধতা দিন দিন প্রকট হয়ে স্থায়ী রূপ নিচ্ছে। উল্লেখ্য, নিষ্কাশন খালে অবৈধ ইজারা এবং কাঁচা পাকা ড্রেনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই লক্ষ্মীপুর জেলা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

আর্সেনিক দূষণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা ০.০১ মি. গ্রা., কিন্তু বাংলাদেশে সহনীয় সর্বোচ্চ মাত্রা ০.০৫ মি. গ্রা./লি.। লক্ষ্মীপুর জেলায় পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেকগুণ বেশি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (২০০১)-এর তথ্যানুসারে জেলায় গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা ১৭৯ মি. গ্রা./লি. এবং জেলার প্রায় ৫৬% নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মি. গ্রা./লি. এর বেশি। নিরাপদ পানির সংকট দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে। জেলার অধিকাংশ জনগণ আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে। সমগ্র জেলাই আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা হিসেবে পরিচিত। তবে লক্ষ্মীপুর সদরের ফাতাহ্পুর, গাজীপুর, তেলহাটি, পশ্চিম শাহপুর, পাছপাড়া, দায়োপাড়া, বাশিকপুর গ্রাম, রায়পুর উপজেলার কলাকোপা, শিবপুর, উদমাড়া, চরপাতা, তাকৈরপাড়া, ব্যাপারী চর, লক্ষ্মীপুর গ্রাম ও রামগঞ্জ উপজেলার শ্রীরামপুর, দনপাড়া, শিবপুর, কামারদিয়া গ্রামের প্রায় ৯০% নলকূপ আর্সেনিক দূষণের শিকার (ম্যাস লাইন মিডিয়া, ২০০১)।

ঘূর্ণিঝড় : প্রতি বছর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস জেলায় আঘাত হানে। তবে, অন্তর্বর্তী উপকূলীয় অঞ্চল বা সদর, রায়পুর, রামগঞ্জ উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু, প্রত্যক্ষ উপকূলীয় অঞ্চল বা রামগতি উপজেলায় ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হবার ঝুঁকি বেশি। যেহেতু জেলায় জেলেদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং এদের অনেকেই মেঘনা মোহনায় মাছ ধরায় নিয়োজিত, তাই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কবলে জেলেদের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েই যায়। আর জেলার দরিদ্র জনসাধারণের জীবনে দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা না গেলে সত্যিকার অর্থে মানবসম্পদের উন্নয়ন সম্ভব নয়। উল্লেখ্য, প্রতি বছর মার্চের শেষ থেকে জুন-জুলাই পর্যন্ত এই জেলায় ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা থাকে, যা জেলার সম্পদ ও জনপদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে।

বন্যা : প্রবল বর্ষণ আর নিষ্কাশন জটিলতার কারণে বন্যার প্রকোপ দেখা যায়। জেলার নদ-নদীর পানি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেলে তা দু'কূল ছাপিয়ে বন্যার রূপ নেয়।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : মাটি ও পানির লবণাক্ততা লক্ষ্মীপুর জেলার একটি অন্যতম দুর্যোগ, যা স্বাভাবিক কৃষি ব্যবস্থায় পানির ব্যবহারকে অনিশ্চিত করে তোলে। এতে একদিকে যেমন, ফসলের ক্ষতি হয়, অন্যদিকে জমির সার্বিক উর্বরতা হ্রাস পায়। বিশুদ্ধ পানির অভাব এই জেলার একটি আঞ্চলিক সমস্যা। নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নদীর মুখ ভরাট হওয়া, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প ইত্যাদি আঞ্চলিক কারণ ও অপরিকল্পিতভাবে চিংড়ি চাষ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব, আর্সেনিক দূষণ প্রভৃতি স্থানীয় কারণে জেলার নিরাপদ পানির সংকট ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ ছাড়া পানিতে লবণ ও আয়রণের অতিরিক্ত পরিমাণ এই সংকটকে আরো বাড়িয়ে তুলছে। আর তাই, এসব এলাকায় পুকুর অথবা বৃষ্টির পানিই প্রধান ভরসা। শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে এখানকার মানুষ লবণাক্ত ও আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করে। তাই এলাকাবাসীরা প্রায়ই চর্মরোগ, পেটের পীড়া, আমাশয়, ডায়রিয়া, প্রজনন স্বাস্থ্যগত সমস্যায় আক্রান্ত হয়।

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি : মূলত সমগ্র বাংলাদেশই গাঙ্গেয় বদ্বীপ হবার কারণে আজ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি হুমকির সম্মুখীন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রীনহাউজ গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। যদি পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ৩০° সেন্টিগ্রেড বাড়ে, তবে সমুদ্রের পানির উচ্চতা এক থেকে দেড় মিটার পর্যন্ত বাড়বে। ফলে দেশের উপকূল এলাকাও নতুন করে সৃষ্টি করা ম্যানগ্রোভ বন ধ্বংস হয়ে যাবে। এই হিসেব থেকে বঙ্গোপসাগর ও মেঘনা নদীর সন্ধিক্ষণে অবস্থিত লক্ষ্মীপুর জেলায় এর ভয়াবহ আশংকা সহজেই অনুমান করা যায়।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তন জেলার আরেকটি সমস্যা। আগাম বর্ষা বা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, আকস্মিক বন্যাসহ সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি জলবায়ুর পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। দীর্ঘ দিন ধরে বৃষ্টি না হবার কারণে খরীফ মৌসুমে খরার সৃষ্টি হয়।

পরিবেশ দূষণ : জলাপূর্ণ জেলা লক্ষ্মীপুর। নিম্নাঞ্চলের কারণে জেলার পরিবেশ আর্দ্র মনে হয়। এর সাথে মানুষের অসচেতনতা, অজ্ঞতা,অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং অবকাঠামো জেলার সামগ্রিক পরিবেশ দূষণে প্রভাব ফেলছে।

সবুজ বেষ্টনী উজাড় : মানুষের অসচেতনতা, জ্বালানি সংকট, দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে সবুজ বেষ্টনী কেটে উজাড় করা হচ্ছে। এর নেপথ্যের কারণ হল অবৈধভাবে গাছ কাটা, কাঠ চুরি, ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো, বন কেটে কৃষি জমি ও মাছের ঘের তৈরি ইত্যাদি। সবুজ বেষ্টনি প্রকল্পের আওতায় এবং বেড়ি বাঁধ ও রাস্তার দু'পাশের লোকজনকে নিয়ে ছোট ছোট দল গঠন করে গাছগুলোর দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই দলগুলোকে সংগঠিত ও সক্রিয় রাখা এবং সবুজ বেষ্টনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্পের আওতায় ১০০ জন বেতনভুক্ত কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়, যারা প্রকল্পের বাইরে সরকারি উদ্যোগে বন বিভাগের লাগানো গাছগুলোরও দেখাশোনা করত। কিন্তু, ২০০২ সালে প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাবার পরে এসব গাছ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ থেমে যায়। তাই লক্ষ্মীপুরের সবুজ বেষ্টনি আজ সম্পূর্ণ উজাড় হবার পথে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : জেলার জলাভূমি ও মোহনায় মাছের প্রাচুর্য্য আজ অনেকাংশেই কমে গেছে। অত্যধিক ও অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরা, মেঘনায় জাটকা নিধন মাছের প্রজাতি হ্রাসের একটি প্রধান কারণ। এ ছাড়া অপরিকল্পিত নদী শাসনের ফলে নদী-নালা ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় মাছের বহু প্রজাতিই আজ বিলুপ্ত হবার পথে।

বিপদাপন্নতা

বিপদাপন্নতা বলতে মানুষের জীবনে বিভিন্ন নেতিবাচক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং সেই নেতিবাচক ঘটনার সাথে মানুষের অভিযোজনের ক্ষমতাকে বুঝায়। বিপদাপন্নতার ধরণ, প্রকার ও ব্যপ্তিতে ভিন্নতা আছে। সব রকম বিপদাপন্নতা দ্বারা জেলার সব এলাকার পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষ সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। উপকূলীয় অঞ্চলের প্রধান জীবিকা দল ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকদের উপর পরিচালিত এক বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৪)-য় দেখা গেছে, লক্ষ্মীপুর জেলার ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবন ও জীবিকায় কৃষি জমির অভাব, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, জমি বন্দোবস্ত ও দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্যতম প্রধান বিপদাপন্নতা। অন্যদিকে সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, মাছের প্রজাতি হ্রাস, নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা ও জলদস্যুদের আক্রমণ জেলেদের জীবনের প্রধান বিপদাপন্নতা। গ্রামীণ মজুরি শ্রমিকদের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রকট। দীর্ঘস্থায়ী কাজের অভাব ও স্বল্প বা নিম্ন মজুরি তাদের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তোলে। সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, কাজের অভাব, গৃহায়ন সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলার অভাবে শহুরে শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেরা প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। অন্যদিকে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপদাপন্ন।

জীবিকা দল	বিপদাপন্নতা
জেলে	সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, মাছের প্রজাতি হ্রাস, নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা, জলদস্যু ও তথ্যশূন্যতা।
ক্ষুদ্র কৃষক	কৃষি জমির অভাব, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, জমি বন্দোবস্ত ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, তথ্যশূন্যতা।
গ্রামীণ মজুরি শ্রমিক	কাজের অভাব ও স্বল্প বা নিম্ন মজুরি
শহুরে শ্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, কাজের অভাব, গৃহায়ন সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

লক্ষ্মীপুরের মোট জনসংখ্যা ১৪.৮৬ লাখ, যার মধ্যে ৭.৪৫ লাখ পুরুষ এবং ৭.৪১ লাখ নারী (বি.বি.এস., ২০০১)। মোট জনসংখ্যার ৮৫% গ্রামে বাস করে।জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১০১। লক্ষ্মীপুর অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ জেলা। সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে এই জেলার অবস্থান ৪র্থ স্থানে। লক্ষ্মীপুরে প্রতি বর্গ কি. মি. এ ১,০২১ জন লোক বাস করে অথচ সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বাস করে ৭৪৩ জন।

শহুরে জনগণ (লাখ)	২.২৪
পুরুষ	১.১৪
নারী	১.০৯
গ্রামীণ জনগণ (লাখ)	১২.৬২
পুরুষ	৬.৩১
নারী	৬.৩১
লিঙ্গ অনুপাত	১০০: ১০১
নির্ভরশীল জনগণের অনুপাত	১.০৮
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	১,০২১
ঘনত্বের ক্রম (৬৪টি জেলার মধ্যে)	১৭
নবজাতক মৃত্যুর হার	৬১
<৫ মৃত্যুর হার	৯৫

০-১৪ ও ৬০$^{+}$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতার অনুপাত ১.০৮, (বি. বি. এস., ২০০১)। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার ৬১ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ৯৫ (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

ঘর-গৃহস্থালি : লক্ষ্মীপুর জেলার শহরাঞ্চলে জনবসতি অনেক কম। শহুরে (০.৪৩ লাখ) ও গ্রামীণ (২.৪৪ লাখ) মিলিয়ে লক্ষ্মীপুরের মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ২.৮৭ লাখ। প্রতিটি গৃহস্থ পরিবারে গড় জনসংখ্যা ৫.২ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি। জীবিকার ধরনের উপর গৃহস্থালির ধরন নির্ভরশীল। ১৯৯৬ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী জেলায় মোট ৪.৫১% গ্রামীণ নারী প্রধান গৃহস্থালি রয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে ঘরের কাঠামো দেখেই একটি পরিবারের আর্থিক অবস্থা অনুমান করা যায়। মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) থেকে জানা যায়, এই জেলার গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের জীবনের একটি অন্যতম সমস্যা হল ভিটে মাটির অভাব। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে অর্থাৎ এক খণ্ড জমির উপর ছোট্ট দোচালা ঘর ও সাথে রান্নার জায়গা নিয়েই দরিদ্র পরিবারগুলো বসবাস করে। ঘরের কাঠামোর বিবেচনায় ২৫% ঘরে পাকা দেয়াল এবং ৬০% ঘরে পাকা ছাদ আছে। ২০০১ সালের লোক গণনার প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী ২৪% ঘরে বিদ্যুতের সংযোগ আছে।

মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	২.৮৭ লাখ
শহুরে	০.৪৩ লাখ
গ্রামীণ	২.৪৪ লাখ
গৃহপ্রতি গড় জনসংখ্যা	৫.২ জন
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির)	৪.৫১%

জনস্বাস্থ্য

১৮৭৬ সালে W.W. Hunter লক্ষ্মীপুরসহ বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার জনস্বাস্থ্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন, "লক্ষ্মীপুরের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা, বিশেষ করে রামগতির কাছাকাছি জলাপূর্ণ এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজমান। আর তাই, ঐ এলাকায় কলেরা, জ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয়, বাতজ্বরের প্রকোপ বেশি"। উল্লেখ্য, লক্ষ্মীপুরের জনস্বাস্থ্য আজও জেলার প্রাকৃতিক প্রতিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। অত্যধিক গরমে বা তাপদাহে জেলায় প্রায়ই ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। বিশুদ্ধ পানির অভাবে এই রোগ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, এ বছর রামগতি উপজেলা ও রায়পুরের চরবংশী, চর আবাবিল, চর মোহনা, চর পাতা ও খাশের হাটে ডায়রিয়ার প্রকোপে প্রায় শতাধিক লোক

আক্রান্ত হয়। শুধু তাই নয়, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য অবকাঠামোর অভাবে ও আর্থিক দৈন্যদশার কারণে আক্রান্ত রোগীরা আধুনিক চিকিৎসা সেবা পায় না। জেলার হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যসেবার অভাবে শিশু মৃত্যুর ঘটনা প্রায়ই ঘটছে।

জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লক্ষ্মীপুর জেলায় ১টি সরকারি হাসপাতাল, ১৫টি বেসরকারি হাসপাতাল, ৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ১৫টি গ্রামীণ ডিসপেন্সারি রয়েছে (বি.বি.এস., ২০০১)। জেলা সদরের একমাত্র সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা মাত্র ১৩৬। অর্থাৎ মোট ১০,৯৩৬ জনের জন্য একটি হাসপাতাল (সরকারি ও বেসরকারি) শয্যা রয়েছে। সমগ্র জেলায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী জোরদার করা প্রয়োজন। জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যেসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হলো, সর্দি-জ্বর, ডায়রিয়া, আমাশয়, স্ক্যাবিস, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া ও পেপটিক আলসার ইত্যাদি।

শিশু স্বাস্থ্য : লক্ষ্মীপুর জেলায় পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৯৫ জন এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে ৭% শিশুই অপুষ্টির শিকার (বি. বি. এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। এই পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে যে, হাম, ডিপিটি ও পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৫৫%, ৫৪% ও ৮৩% শিশু। এ ছাড়া ৩৩% শিশু ORT নিয়েছে। ৬৯% গৃহ আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহার করে।

৫ বছরের কম শিশু মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৯৫
১২-৫৯ মাস বয়সী শিশু অপুষ্টির হার	৭%
আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহাকারী গৃহ	৬৯%

পানি ও পয়ঃসুবিধা : নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৮৭% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে। বাকী ১৩% অন্যান্য উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করে চাহিদা পূরণ করে। উল্লেখ্য, লক্ষ্মীপুরে ৫৬% নলকূপেই আর্সেনিকের দূষণ পরীক্ষা করা হয়নি এবং মোট জনসংখ্যার মাত্র ৪৭% মানুষ আর্সেনিক বিষক্রিয়ার কথা শুনেছেন (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। লক্ষ্মীপুরের নলকূপের প্রতি ১ লিটার পানিতে আর্সেনিকের গড় মাত্রা ১৭৯ মাইক্রোগ্রাম যা সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের হিসেব অনুসারে (২০০২) লক্ষ্মীপুর জেলার গ্রামীণ এলাকায় ১১১ জন লোকের জন্য একটি করে সক্রিয় টিউবওয়েল রয়েছে এবং প্রতি বর্গ কি. মি.-এ সক্রিয় টিউবওয়েলের সংখ্যা ৯টি। জেলায় মাত্র ৪৬% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা এবং ৪১% ঘরে কাঁচা পায়খানা রয়েছে। এ ছাড়া ১৩% ঘরে কোনরকম কাঁচা বা পাকা পায়খানার সুবিধা নেই। শহর ও গ্রামাঞ্চলের পয়ঃসুবিধার চিত্র এক নয়।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানাসহ গৃহ	৪৬
অন্যান্য সুবিধাসহ গৃহ	৪১
পায়খানার সুবিধাবিহীন গৃহ	১৩
কল বা নলকূপের উপর নির্ভরশীর গৃহ	৮৭

শিক্ষা

লক্ষ্মীপুর জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার উপকূলীয় জেলাগুলোর মধ্যে ১৩তম স্থানে। সাত বছর বয়সের উপরের মোট জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার প্রায় ৪৩% (বি.বি.এস., ২০০১)। অন্যদিকে, প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বছর বয়সী ও তার ঊর্ধ্বের জনসাধারণের সাক্ষরতার হার ৪৭%।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (২০০৩)-এর তথ্য অনুযায়ী লক্ষ্মীপুর জেলায় সর্বমোট ৭০২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এরমধ্যে ৫১২টি সরকারি। এই বিদ্যালয়গুলোতে মোট ২,১৭,৭৭১ জন ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ৯৩%। প্রাইমারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার তুলনায় মোটামুটি পর্যাপ্ত। জেলায় প্রতি ১০০০০ জনগণের জন্য গড়ে ৫টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, যা জাতীয় গড় সংখ্যা (৬)-এর তুলনায় কম (প্রা.শি.অ., ২০০৩)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষক সংখ্যা ২৯২৮ জন। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৭৪:১। এ ছাড়া বি.বি.এস., ১৯৯৮-এর তথ্য অনুযায়ী লক্ষ্মীপুর জেলায় মোট ১০টি কিন্ডার গার্টেন রয়েছে।

সাক্ষরতার হার (৭^{+})	৪৩%
প্রাপ্ত বয়স্কদের সাক্ষরতার হার (১৫^{+})	৪৭%
জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	২৩
মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়	১৩৬
কিন্ডার গার্টেন	১১২
উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ	২০
মাদ্রাসা	১১৭
মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭০২
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫১২
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	২,১৭,৭৭১
ভর্তির হার	৯৩
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (সংখ্যা /১০,০০০জন)৫	

জেলায় মোট ২৩টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে, যার ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সংখ্যা যথাক্রমে ৪,৪০৯ ও ১৭৪ অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ২৫:১। আবার জেলার মোট ১৩৬টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৭৮,৮৮৬ জন। মোট শিক্ষক সংখ্যা ২,২৬৪ জন। অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩৫:১। অন্যদিকে জেলার মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ১১৭টি। মোট ২৭,১৬৭ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য ২,০৮০ জন শিক্ষক এখানে কর্মরত আছেন। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১৩:১, যা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় ভাল। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মোট ২০টি মহাবিদ্যালয় আছে যার মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৭,৮৩৭ জন এবং ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৩৮:১।

উল্লেখ্য, লক্ষ্মীপুর জেলার প্রাচীন ও ঐতিহ্যমণ্ডিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। আর সেগুলো হল লক্ষ্মীপুর আলিয়া মাদ্রাসা (১৯৭২), রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা (১৮৮৬), লক্ষ্মীপুর আদর্শ সমাজ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৮৬), লক্ষ্মীপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৮৯৯), রায়পুর এল.এম. পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ইত্যাদি।

অভিবাসন

লক্ষ্মীপুর জেলার চরাঞ্চলে অন্যান্য এলাকা বিশেষ করে নোয়াখালী, হাতিয়া, ভোলা, সন্দীপ থেকে নদী ভাঙ্গা মানুষ এসে বসতি গড়ে তুলছে। জীবিকার প্রয়োজনে এদের কেউ কেউ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছে। বি.বি.এস., ১৯৯১-এর গণনা অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যার (১৩.১২ লাখ) প্রায় ২% জনগণ লক্ষ্মীপুরের বাইরে থেকে আগত।

সামাজিক উন্নয়ন

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর বয়সী), নিরাপদ পানি সুবিধা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয় একটি জেলার সামগ্রিক সামাজিক উন্নয়নকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে পাওয়া সংখ্যা ও গণনার ভিত্তিতে বলা যায়, লক্ষ্মীপুর জেলা সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে নেই। কেননা সাক্ষরতার হার, স্বাস্থ্যসেবা - এই দুই ক্ষেত্রে জেলার অগ্রগতি হয়নি।

সাক্ষরতার হার (৭^{+} বছর)	৪৩%
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	৮৭%
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	৪৬%
শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা	১০,৯৩৬

প্রধান জীবিকা দল

মাটির উর্বরতা, জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, জমির খণ্ডায়ন আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন, নদী ভাঙন, জলাবদ্ধতা, জোয়ার মেঘনা মোহনার অফুরন্ত মাছ, এই জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। চাষের জমির ক্রম বিভাজন

একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর আর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। অন্যদিকে কৃষক থেকে কৃষি শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে মানুষ। জেলেদের নিরাপত্তাহীনতা, নদী-নালা ও মোহনা আর খালে মাছ কমে যাওয়া, মাছ ধরার উপকরণের উচ্চ মূল্য আর দাদন বা মহাজনী ব্যবসার কবলে পড়ে জেলেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পেশা থেকে সরে আসছে। উল্লেখ্য, জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হলো : ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক (প্রধানত কৃষি শ্রমিক), শহুরে শ্রমিক ও জেলে। এ ছাড়াও অন্যান্য কাজকর্ম করে লক্ষ্মীপুরের মানুষেরা সংসার চালায়।

জেলে : লক্ষ্মীপুরের উপকূলীয় এলাকা ও চরাঞ্চলে বিশাল জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। মোহনা, গভীর সমুদ্রে ট্রলার অথবা নৌকা নিয়ে এরা মাছ ধরে। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আবার মুসলমানদের অনেকেই মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। মোট জেলে পরিবারের সংখ্যা ২৮,০০০, যা কৃষিজীবী পরিবারের ১৫%। এখানে ১,০০০ বড় জেলে পরিবার, ৫,০০০টি মাঝারি জেলে পরিবার এবং ২২,০০০ ছোট জেলে পরিবার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী লক্ষ্মীপুর জেলায় মোট ৫০,০০০ জেলের বসবাস। জেলেদের জীবিকার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্যজীবী বা জেলে গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা যেতে পারে।

জলদস্যুদের আক্রমণ, মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই, জীবননাশ - এই সবই আজকালকার জেলেদের জীবনে প্রায়ই ঘটছে। এ ছাড়া, দাদন বা মহাজনী শোষণ তো রয়েছেই। তাই, মেঘনা মোহনায় পেশাদার জেলেদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

কৃষক : জেলার মোট ক্ষুদ্র কৃষক (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫ - ২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১,৬২,৫০৯টি, মাঝারি কৃষক (২.৫০ - ৭.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১৭,৮৪৫টি এবং বড় কৃষক (৭.৫০^{+} একর) পরিবারের সংখ্যা মোট ২,৭৭৭টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং পরিবারের বিভাজনে মাথা পিছু জমির পরিমাণও ব্যাপক হারে কমছে। ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। জেলায় মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ৮২,৪৬৭টি (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

শহুরে শ্রমিক : জেলায় শহুরে শ্রমিকের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। কৃষি জমির অভাব, কাজের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের (সিইজিআইএস, ২০০৪) কারণে গ্রামের ভূমিহীন ও অন্যান্য পেশার মানুষ শহরে এসে ভিড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এদের কেউ কেউ যোগালী, নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, তাঁত শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ, লক্ষ্মীপুর জেলায় সামগ্রিকভাবে দিনমজুরির উপর নির্ভরশীলতা ক্রমশ বাড়ছে।

চিংড়ি চাষী : জেলায় কৃষকরা চিংড়ি চাষে উৎসাহী হয়ে উঠছে। তাই পেশান্তর ঘটছে। অর্থাৎ কৃষক হয়ে যাচ্ছে চিংড়ি চাষী, চিংড়ি চাষীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আশপাশের চিংড়ি চাষীদের সফলতা দেখে বর্তমানে বহু কৃষকই তাদের চাষের জমিকে চিংড়ি ঘেরে রূপান্তরিত করছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা

জেলার মোট কর্মক্ষম জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ - এ সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণের প্রধান নির্দেশক। ১৯৯৯/২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী লক্ষ্মীপুরে কর্মক্ষম জনশক্তি ৪৯২ হাজার, যার মধ্যে ৬৮% পুরুষ। উল্লেখ্য, ১৯৯৫/৯৬ সালে কর্মক্ষম জনশক্তি ছিল ৪৯৯ হাজার (যার মধ্যে ৬১% পুরুষ) অর্থাৎ লক্ষ্মীপুরে কর্মক্ষম পুরুষদের সংখ্যা ক্রমশ কমছে (বি.বি.এস., ২০০১)। চলতি বাজারদর অনুযায়ী জেলার বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ১৫,৫১৮ টাকা। লক্ষ্মীপুরে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৬ হেক্টর এবং প্রায় ৩০% কৃষি শ্রমিক পরিবার (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

মাথাপিছু আয় (টাকা)	১৫,৫১৮
বি.বি.এস. ক্রম (মাথাপিছু আয় অনুসারে)	২৩
মোট শিল্পে আয়	১৩
স্থিরদরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৪.৮
বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন খানা	২৪

দারিদ্র্য

লক্ষ্মীপুর জেলার মোট জনসংখ্যার ৭৩% দরিদ্র এবং ৩৯% অতিদরিদ্র (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)। এ ছাড়া জেলার মোট ৫৬% লোক ভূমিহীন এবং ৬৮% ক্ষুদ্র কৃষক (বি.বি.এস., ১৯৯৬)।

দরিদ্র	৭৩
অতিদরিদ্র	৩৯
ভূমিহীন	৫৬
ক্ষুদ্র কৃষক	৬৮

নারীদের অবস্থান

সম্প্রতি সি.পি.ডি-ইউ.এন.এফ.পি.এ বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক তৈরি করেছে। এতে দেখা যায় লক্ষ্মীপুর জেলা "মাঝারি মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। এখানে নারীরা পর্দাপ্রথার মধ্যে বসবাস করে। তাই, বোরখা পরে বাইরে চলাচল, মাঠে, ক্ষেতে-খামারে কাজ করার প্রচলন রয়েছে । নগরায়ণ, শিক্ষা, অনুকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য - এ সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

লিঙ্গ অনুপাত : লক্ষ্মীপুরের মোট জনসংখ্যার ৪৯.৮% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০১। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) জনসংখ্যার লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ১১২। অর্থাৎ, জন্মের সময় থেকে বয়ঃসন্ধিক্ষণের বয়স দলে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের সংখ্যা অনেক বেশি। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০: ৮৬ (বি.বি.এস., ২০০১)। অর্থাৎ প্রজনন বয়স দলে নারীদের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি।

- **১৫-৪৯ বছরের লিঙ্গ অনুপাত (৮৬) জাতীয় অনুপাতের (১০০) তুলনায় কম।**
- **মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩ জন , যা জাতীয় (৫ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫ জন) তুলনায় কম ।**
- **সাক্ষরতার হার (৪১%) জাতীয় হারের (৪১%) সমান।**
- **স্বামী পরিত্যক্তা নারীর সংখ্যা (০.১৯%) জাতীয় সংখ্যার (০.৩৭%) তুলনায় কম।**
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার (১০৬) জাতীয় হারের (৯৮) তুলনায় বেশি।**
- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (৯৫) জাতীয় হারের (৯২) তুলনায় বেশি।**
- **জেলায় ১৩-৪৯ বয়স দলের নারীদের মধ্যে আধুনিক জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারের হার ৩২%, যা জাতীয় (৪৪%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৪১%) হারের তুলনায় কম।**
- **কৃষিজীবী নারী প্রধান গৃহের সংখ্যা (৪.৫১%), জাতীয় সংখ্যার (৩.৪৪%) তুলনায় বেশি।**

বৈবাহিক অবস্থান : জেলার ১০ বছর ও তার উর্ধ্বে মোট জনসংখ্যা হল ১০.২২ লাখ। এর মধ্যে ৩৩% নারী বিবাহিত এবং ০.১৯% নারী স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮৯% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)।

প্রজনন স্বাস্থ্য : জেলার নারীদের মোট প্রজনন হার ৩.১ (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ৩টি সন্তান জন্ম দেয়। জেলার মাতৃমৃত্যুর হার নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। পরিবার পরিকল্পনা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)-এর তথ্য অনুসারে, জেলায় মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৩ জন, যা নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন, ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যু হারকে প্রভাবিত করে। জেলার ১৩-৪৯ বয়স দলের মোট ৩২% নারী আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ৪১% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

শ্রম বিভাজন : নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। তবে, দরিদ্র পরিবারের নরীরা ঘরের বাইরে প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়া, দিনমজুরি ও পরের গৃহে শ্রম দেয়। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মক্ষম পুরুষ সদস্যের অভাব ও দারিদ্রের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নিতে বাধ্য হয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দাপ্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন, আইন- শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এই জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রমউন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিওদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম ও প্রকল্প কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করছে।

শ্রমশক্তি : লক্ষ্মীপুরের নারীদের মধ্যে কর্মক্ষম শ্রম শক্তির হার ক্রমশ কমছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে কর্মক্ষম শক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনগণের ৩৯% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে তা কমে হয় ৩২% (বি.বি.এস., ২০০১)। এর মধ্যে ৩১% গ্রামীণ নারী ও শহুরে নারী ৪৫%। অর্থাৎ গ্রাম ও শহরে নারীরা কাজ করছে। মূলত প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, গ্রামীণ নারীরা সেই চিরায়ত অধঃস্তনতা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। আর তাই, গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের ২% নারীদের পরের জমিতে কাজ করতে দেখা যায় (বি.বি.এস., ১৯৯৬)। জেলার ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২৩% অর্থ বা খাদ্যের বিনিময়ে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে ২৬% (নিপোর্ট, ২০০৩)।

স্বাস্থ্য পুষ্টি : জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৬০ জন। অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা জেলার নারীর স্বাস্থ্য দশাকে আক্রান্ত করছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ৭%, যা জাতীয় হারের (৬%) তুলনায় বেশি। পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি ও পয়:সুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৮% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন । ৯৩% ক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন। মাত্র ১% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান। তবে, আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৫.৩% (বি.বি.এস-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ জেলার নারীরা প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণে পিছিয়ে আছে।

শিক্ষা : লক্ষ্মীপুরের নারীদের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক নয়। কেননা ৭ বছর$^{+}$ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মাত্র ৪১%, যা প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার (৪৪%)-এর তুলনায় কম (বি.বি.এস., ২০০১)। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্মীপুরের মেয়েরা এগিয়ে আছে। মোট ছাত্রছাত্রীর ৪৪% মেয়ে শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ১০৬। একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর ৫০% ছাত্রী এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীর ৫১% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রীসংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। মাত্র ৩৮% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে।

নারী নির্যাতন : ঘরের ভেতরে-বাইরে নারীরা প্রতিনিয়তই নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার। ঘরে নারী নির্যাতন জেলার একটি অতি পরিচিত ঘটনা। এ ছাড়া যৌতুক, বাল্য বিয়ে, বহু বিয়ে, নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণ, জোরপূর্বক বিয়ে, মজুরী শোষণ এবং নারী ও শিশু পাচার জেলার নারী নির্যাতনের অন্যতম কয়েকটি উদাহরণ। চর এলাকায় ভূমিবণ্টন, ফসল লুট, সীমানা দখল, জমি দখল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই আছে। তাই চরঞ্চলের নারী, হিন্দু সম্প্রদায়, ও শিশুরা আজ চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। স্থানীয় জনমত অনুসারে, বহু বিয়ে ও মৌসুমী বিয়ের মাধ্যমে চরাঞ্চলে সুবিধাবাদী শ্রেণীর লোকেরা জমি ও নারীর ভোগ দখল অব্যাহত রেখে চলেছে। প্রতারণা, লাঞ্ছনা আর নির্যাতন চরাঞ্চলের নিত্য দিনের ঘটনা। ফলে সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের বঞ্চনার চিত্র আরো করুণ।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট

বি.বি.এস., ২০০৩-এর তথ্য অনুযায়ী, লক্ষ্মীপুর জেলায় মোট ১,২৬৮ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। সড়ক ও জনপথ বিভাগের মোট ৩৮৫ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ৩৪৬ কি.মি. ফিডার রোড-এ ৩৯ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক। উল্লেখ্য, লক্ষ্মীপুর জেলায় জাতীয় মহাসড়ক নেই। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) ৪৪ কি.মি. ফিডার রোড-বি, ৪৩৪ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা, ৪০৫ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা ধরন-২ রয়েছে। জেলায় রাস্তার ঘনত্ব ০.৭৫ কি.মি./ বর্গ কি.মি., যা উপকূল অঞ্চলের অবস্থার তুলনায় ভাল। জেলার মানুষের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করতে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কেননা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে একদিকে যেমন, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষিসহ অন্যান্য পণ্য সরবরাহ এবং বাজারজাত করতে না পারায় জেলার অর্থনীতি দুর্বল থেকে যাচ্ছে, ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সুবিধা পাচ্ছে না। বিছিন্ন চরাঞ্চল ও মূল ভূ-খণ্ডের মানুষের মধ্যে ব্যবধান থেকে যাচ্ছে।

পাকা রাস্তা	১,২৬৮ কি. মি.
সওজ রাস্তা	৩৮৫ কি. মি.
এলজিইডি রাস্তা	৮৮৩ কি. মি
রাস্তার ঘনত্ব	০.৭৫ কি. মি./ বর্গ কি.মি.

পোল্ডার

সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে বিগত ষাটের দশকে লক্ষ্মীপুর জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়। জেলায় মোট ২টি পোল্ডার রয়েছে। পোল্ডার ৫৯/১ (সুধারাম, লক্ষ্মীপুর সদর) ও পোল্ডার ৫৯/২ (রামগতি)-এর সাহায্যে ৩৯,৪৭৩ হে. জমি রক্ষা করা হয়েছে। এই পোল্ডার এলাকায় রয়েছে ১২২ কি.মি. দীর্ঘ বেড়ি বাঁধ, ৩০টি রেগুলেটর ও ৫৮৬ কি.মি. দীর্ঘ নিষ্কাশন খাল (সি.ই.আর.পি, ২০০০)। এই সমস্ত কাঠামোর মাধ্যমে জেলার পানি ব্যবস্থাপনার কাজটি চলে। উল্লেখ্য, জেলার উপকূলবর্তী বাঁধের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। এলাকাবাসীর অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহযোগিতার অভাব, বনায়নের অভাব, দুর্বল বাঁধ, বাঁধের ফাটল নদী ভাঙনের তীব্রতাকে বাড়িয়ে তুলছে। তাই এসব এলাকায় লোনা পানির প্রবেশ, প্লাবন, ফসলহানি, চাষের মাছ ভেসে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

বাঁধ	১২২কি. মি.
রেগুলেটর	৩০টি
নিষ্কাশন খাল	৫৮৬ কি. মি.

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

জেলায় বিভিন্ন স্থানে মোট ১১০টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে (এল.জি.ই.ডি, ২০০৩)। এই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে জেলার মোট জনসংখ্যার ১৫% জনগণ আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো ঘুর্ণিঝড়ের সময় জান-মালের নিরাপত্তা দেয় আর অন্য সময়ে বিদ্যালয় ও খাদ্য গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা, ভোগ্যপণ্যের বিস্তারের কারণে জেলায় হাট বাজারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জেলায়

মোট ১২৩টি হাট-বাজার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৮)। লক্ষ্মীপুর, চন্দ্রগঞ্জ, দালাল বাজার, মান্দারী বাজার, জকসিন হাট, পোদ্দার হাট, ভবানীগঞ্জ বাজার, ফরাশগঞ্জ বাজার ইত্যাদি জেলার প্রধান কয়েকটি হাটবাজার। এ ছাড়া এখানে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের মেলা বসে। এর মধ্যে দালালপুর ঝুলান যাত্রা মেলা, দেওয়ান শাহ্ মেলা, শ্যামপুর মেলা উল্লেখযোগ্য।

হাটবাজারের খতিয়ান

উপজেলা	সংখ্যা
সদর	৪৫
রায়পুর	২৩
রামগঞ্জ	১১
রামগতি	৪৪
মোট	১২৩

হাতিয়া, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও বরিশালের পথে রামগতিতে স্টীমার যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। লক্ষ্মীপুরে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ কৃষিকাজ, মাছ ধরা ও মাছ চাষে নিয়োজিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক নদী বন্দর গড়ে ওঠেনি। তাই নৌ ও খেয়া ঘাটগুলোতে কৃষক ও জেলেদের উৎপাদিত ও আহরিত কৃষি পণ্য সরবরাহ করতে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ

লক্ষ্মীপুর জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পন্ন ঘরের সংখ্যা ৬৭,৮৪০, যা মোট ঘরের ২৪%। তবে শহর ও গ্রামে বৈদ্যুতিক সংযোগের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহরের মোট ৪৯% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অথচ গ্রামে এর পরিমাণ মাত্র ১৯%। এই হার জেলায় নগরায়ণের বিস্তারকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে জেলার মাত্র ৩% ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল (বি.বি.এস., ১৯৯৪, ২০০১)। অর্থাৎ এক দশকের তুলনায় লক্ষ্মীপুরের বৈদ্যুতিক কাঠামোর অবস্থা বর্তমানে ভাল। পল্লী বিদ্যুতের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীপুর স্টেশন থেকে সমগ্র জেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় জেলার ৪টি উপজেলার মোট ১,৪৫৬ বর্গ কি.মি. এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে বর্তমানে জেলায় মোট টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা ৫৩৫টি (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

শহরে বিদ্যুৎ সংযোগ	৪৯%
গ্রামীণ বিদ্যুৎ সংযোগ	১৯%
পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ	১,৪৫৬ বর্গ কি.মি.

শিল্প ও বাণিজ্য অবকাঠামো

শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লক্ষ্মীপুর একটি অবহেলিত এবং অনগ্রসর জেলা। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এখানে ভারী ও অত্যাধুনিক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। জেলার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর এবং শত বছরের ইতিহাসে এই কৃষি নির্ভর অর্থনীতিতে তেমন কোন কাঠামোগত পরিবর্তন আসেনি। ব্রিটিশ সাশন আমলে কিছু ক্ষুদ্র কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়া বড় ধরনের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জেলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলেও বৃহৎ কোন ব্যবসায়ী শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। আর তাই এখন পর্যন্ত জেলার রপ্তানী দ্রব্য বলতে কৃষিপণ্যকেই বোঝানো হয়।

জেলায় কয়েক ধরনের ছোট বড় শিল্প কলকারখানা রয়েছে। এর মধ্যে টেক্সটাইল মিল, তাঁত, ধান কল, ময়দা কল, কাঠের কল, বরফ কল, অ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরি, বিড়ি ফ্যাক্টরি, মোমবাতির ফ্যাক্টরি, প্রিন্টিং প্রেস, তেল কল, বেকারী, ছাপাখানা, বাঁধাই কারখানা ও ব্যাটারী ফ্যাক্টরি অন্যতম। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মধ্যে বাঁশ, বেত, কাঠের কাজ, যন্ত্রাংশ ঝালাই কারখানা, রিক্সা, রেডিও-টিভি মেরামত কারখানা, জাল তৈরি, কামার ইত্যাদির কথা বলা যায়। জেলায় ৫৮টি মাছের খামার, ১৬টি মাছের নার্সারী, ১০২টি পশুসম্পদ খামার, ২২২টি হাঁস-মুরগির খামার ও ৩টি হ্যাচারী আছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৩ সালে তৎকালীন নোয়াখালী জেলা লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার রাখালীয়া বাজারে 'নোয়াখালী টেক্সটাইল মিল' টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ২৬ কোটি টাকা মূলধন ও ১২ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে এটি স্থাপিত হলেও অব্যাহত লোকসান বা ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণে মিলটি দীর্ঘ দিন যাবত বন্ধ রয়েছে।

সেচ ও গুদাম সুবিধা

জেলার কৃষিজীবী লোকেরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী - দুই ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। এখানে আধুনিক সেচ প্রযুক্তি বলতে প্রধানত নলকূপ, গভীর ও অগভীর নলকূপ, এল.এল.পি

মোট সেচ এলাকা	২১,৮০৮ হে.
সেচ এলাকা (শতকরা)	২৬%
ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার	৩.৫%
উপরিভাগের পানি ব্যবহার	২২.১%

পাম্প ইত্যাদিকে বুঝায়। জেলায় মোট সক্রিয় অগভীর নলকূপের সংখ্যা ১০৫টি, এল.এল.পি ৮২৯টি, গভীর নলকূপ ২৮টি, পাম্প ১৩০২টি এবং ৪৪২টি ঐতিহ্যবাহী প্রযুক্তির আওতায় মোট ২১,৮০৮ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয় (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

লক্ষ্মীপুরে উৎপাদিত কৃষিপণ্য গুদামজাতকরণের সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। (বি.বি.এস., ১৯৯৮)-এর অনুসারে, এই জেলায় মাত্র ২২টি খাদ্য গুদাম রয়েছে। যাদের প্রতিটির খাদ্যদ্রব্য ধারণ করার ক্ষমতা হল ১১,৭৫০ মে. টন। এ ছাড়া এখানে বীজ সংরক্ষণের জন্য ২০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতার ১টি গুদাম আছে। উল্লেখ্য, জেলায় সার সংরক্ষণের জন্য কোন গুদাম নেই।

গুদামের ধরন	সংখ্যা	ধারণ ক্ষমতা (মে.টন)
খাদ্য	২২	১১,৭৫০
বীজ	১	২০০

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

লক্ষ্মীপুরে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দেখা যায়। এর মধ্যে ২০২টি ক্লাব, ১৫০টি নারী সংগঠন, ১৫০টি সমবায় সমিতি, ২২টি গণ গ্রন্থগার, ১টি সঙ্গীত বিদ্যালয়, ৮টি থিয়েটার দল, ১০টি সিনেমা হল, ২৪টি ডাকঘর ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১,৬৯৯টি মসজিদ, ১টি খ্রিষ্টীয় উপসানালয়, ৪৫টি মন্দির, ৬টি দরগাহ্, ১৫টি মাজার, ২টি আশ্রম, ৮টি হরিসভা ও ১টি হিন্দুদের পবিত্র/তীর্থ স্থানের কথা উল্লেখযোগ্য।

উন্নয়ন প্রকল্প

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে লক্ষ্মীপুরে ১১টি সরকারি সংস্থার মোট ১৯টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, এখানে যে সব প্রকল্প কেবল ২০০৪ সালের জুন মাসের পরে চালু আছে ও থাকবে তাদের হিসেব তুলে ধরা হয়েছে। যে সমস্ত সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে, তা হলো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ বিভাগ, মৎস্য বিভাগ, জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ (বিটিটিবি), শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলো প্রধানত বাংলাদেশ সরকার, ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, নেদারল্যান্ডস সরকার, যুক্তরাজ্য সরকার, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফ ও কুয়েত সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন। এ ছাড়া জেলার দু:স্থদের নিরাপত্তা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ সেবা অধিদপ্তর এবং বিশ্ব খাদ্য সংস্থা কাজ করছে।

সরকারি সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	৪
মৎস্য বিভাগ	১
পশু সম্পদ অধিদপ্তর	১
জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর	৩
সড়ক ও জনপথ বিভাগ	৩
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	১
বিটিটিবি	১
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

লক্ষ্মীপুর জেলায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক এনজিও-র উন্নয়ন কর্মকাণ্ড রয়েছে। বড় এনজিওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, কেয়ার-বাংলাদেশ, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক-এর নাম উল্লেখ্যযোগ্য। এ ছাড়া স্থানীয় সক্রিয় এনজিও-র মধ্যে এনআরডিএস, এমসিসি, ত্রিবেদী মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, ইউসেপ, গণউন্নয়ন সংস্থা, সেবা সোসাইটি, আল-আমীন, আরডিএ, এনআরডিপি, নিজেরা করি, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলছে। প্রধান চারটি বড় এনজিও - আশা, ব্র্যাক, প্রশিকা ও কারিতাস কক্সবাজারে কাজ করে। এদের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত জেলার মোট ১৪% গৃহস্থ। গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ ৬,৬৫০ টাকা মাত্র (আইসিজেডএম, ২০০৩)।

ক্ষুদ্রঋণ কর্মকাণ্ডের খতিয়ান	
ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারী গৃহস্থ (জন)	৪০,২৯৯
% গৃহস্থ (মোট)	১৪%
মোট ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকা)	২৬.৮০
গৃহস্থ প্রতি ঋণের পরিমাণ (টাকা)	৬,৬৫০

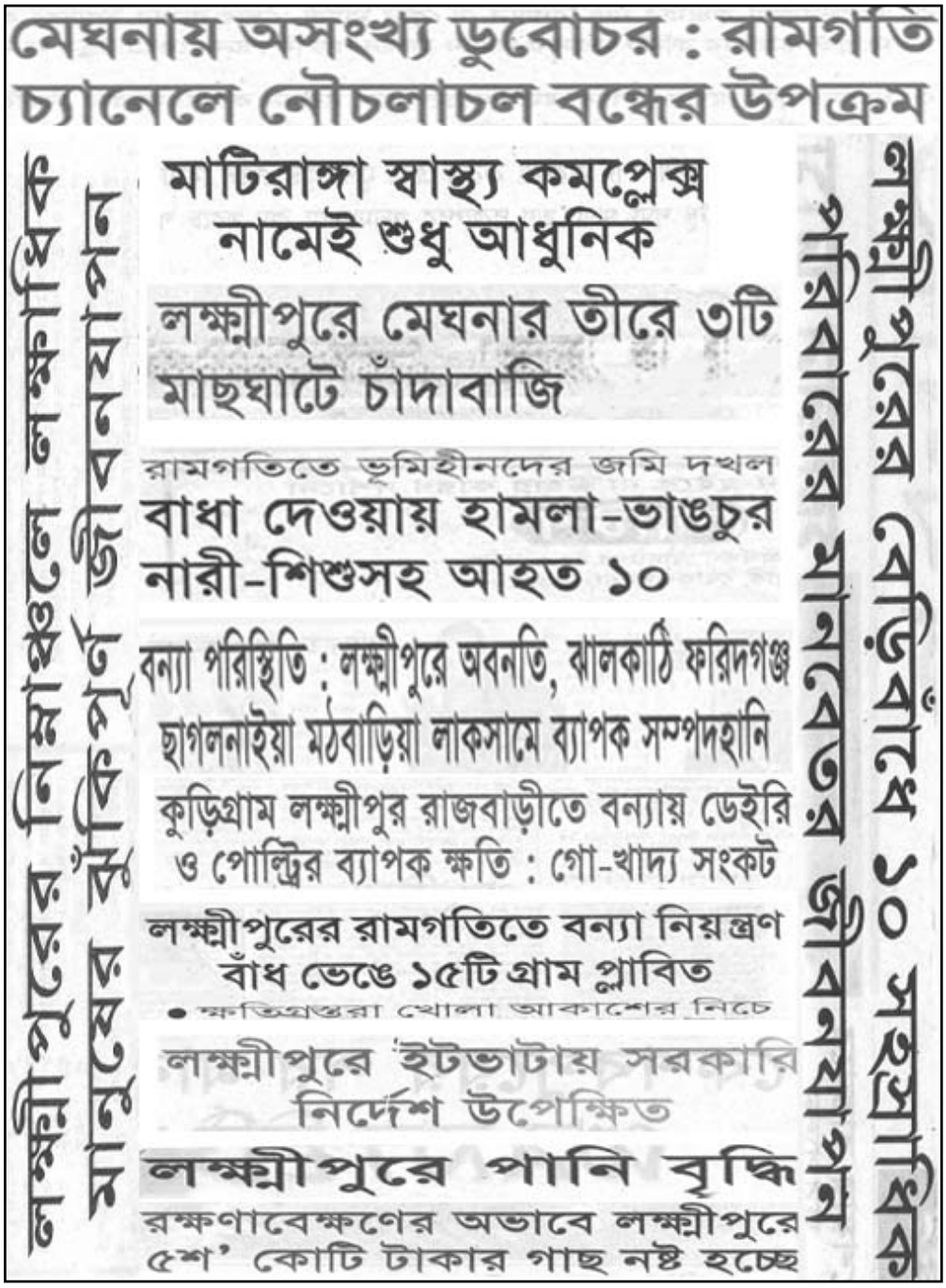

মেঘনায় অসংখ্য ডুবোচর : রামগতি চ্যানেলে নৌচলাচল বন্ধের উপক্রম

মাটিরাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নামেই শুধু আধুনিক

লক্ষ্মীপুরে মেঘনার তীরে ৩টি মাছঘাটে চাঁদাবাজি

রামগতিতে ভূমিহীনদের জমি দখল বাধা দেওয়ায় হামলা-ভাঙচুর নারী-শিশুসহ আহত ১০

বন্যা পরিস্থিতি : লক্ষ্মীপুরে অবনতি, ঝালকাঠি ফরিদগঞ্জ ছাগলনাইয়া মঠবাড়িয়া লাকসামে ব্যাপক সম্পদহানি

কুড়িগ্রাম লক্ষ্মীপুর রাজবাড়ীতে বন্যায় ডেইরি ও পোল্ট্রির ব্যাপক ক্ষতি : গো-খাদ্য সংকট

লক্ষ্মীপুরের রামগতিতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে ১৫টি গ্রাম প্লাবিত

• ক্ষতিগ্রস্তরা খোলা আকাশের নিচে

লক্ষ্মীপুরে 'ইটভাটায় সরকারি নির্দেশ উপেক্ষিত

লক্ষ্মীপুরে পানি বৃদ্ধি

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে লক্ষ্মীপুরে ৫শ' কোটি টাকার গাছ নষ্ট হচ্ছে

লক্ষ্মীপুরের নিম্নাঞ্চলে লক্ষাধিক মানুষের ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপন

লক্ষ্মীপুরের বেড়িবাঁধে ১০ সহস্রাধিক পরিবারের মানবেতর জীবনযাপন

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

লক্ষ্মীপুরের মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বণ্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩, ২০০৪) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে, তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

পরিবেশগত সমস্যা
- নদী ভাঙন
- জলাবদ্ধতা
- আর্সেনিক দূষণ
- সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস
- জোয়ার
- বন্যা
- মাটি-পানির লবণাক্ততা
- সবুজ বেষ্টনী উজাড়
- পরিবেশ দূষণ
- মাছের প্রজাতি হ্রাস
- জলবায়ুর পরিবর্তন

ভূমি বন্দোবস্তের সমস্যা
- খাস জমি বণ্টন
- ভূমিহীনদের পুনর্বাসন
- সীমানা বিরোধ

কৃষি সমস্যা
- সার ও কীটনাশকের ব্যবহার
- চিংড়ি চাষের প্রতিবন্ধকতা
- কোল্ড স্টোরেজের অভাব
- খাল খনন
- গবাদিপশু সমস্যা

আর্থ-সামাজিক সমস্যা
- মেঘনায় জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য
- চরাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবার অনুপস্থিতি
- দাদন
- টোল আদায়
- বন বিভাগ ও ভূমিহীনদের দ্বন্দ্ব
- বাল্য বিয়ে ও বহু বিয়ে
- ঋণ সুবিধা
- আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- নারী পাচার
- তথ্যশূন্যতা

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা
- উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাব
- পর্যটন গাইড

পরিবেশগত সমস্যা

নদী ভাঙন : লক্ষ্মীপুরে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমের শুরুতে মেঘনা নদী ও রহমতখালী নদীর ভাঙন ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। এই অব্যাহত ভাঙনের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় জীবন ও সম্পদের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হয়।

আর্সেনিক দূষণ : লক্ষ্মীপুর জেলার আর্থ-সামাজিক সংকটে জরাজীর্ণ নিরন্ন মানুষের জীবনে আর্সেনিক দূষণ একটি ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় : আপদকালীন নিরাপত্তার অভাব ও অপর্যাপ্ত বিপদ সংকেতের জন্য সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে জেলার মানুষের ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষতি হয়।

নদী-নালা ও খাল ভরাট : জেলার নদী-নালা ও খালগুলো ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই জেলার সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা আজ ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন।

জলাবদ্ধতা : জলাবদ্ধতার কারণে কৃষি কাজ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, সংস্কারের অভাব ও নদী শাসন ব্যবস্থা এবং জটিল পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে জেলার নদ নদীগুলোতে পলি জমছে এবং পলি পড়ে অকালে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে জেলার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে। সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী লবণাক্ততা; নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারিয়ে অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং শহর, গ্রাম ও জনপদের মানুষকে বিপদাপন্ন করে তুলছে।

জোয়ার : ভরা জোয়ারের সময় চরের জনপদ তলিয়ে যায়। পানির মধ্যে জনসাধারণ অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে বসবাস

করে। বর্ষায় লোনা পানি আর কাদা চরাঞ্চলের অধিবাসীদের অবর্ণনীয় কষ্টের কারণ। জোয়ারের আসা যাওয়ার উপর নৌ পরিবহন ব্যবস্থা নির্ভরশীল, যার কারণে চরাঞ্চলের লোকজনদের যাতায়াতে অপরিসীম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

বন্যা : প্রবল বর্ষণ আর নিষ্কাশন জটিলতার কারণে জেলার নিম্নাঞ্চল সহজেই বন্যায় প্লাবিত হয়। একটানা কিছুদিন বৃষ্টি হলেই জলাবদ্ধতা বন্যায় রূপ নেয়। এতে জলাশয়ের মাছ, ফসল, গো-সম্পদ, হাঁস-মুরগি আর ঘর-গেরস্থালির সবজি বাগান, গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যা উত্তরকালে পানিবাহিত রোগ ও চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

মাটি-পানির লবণাক্ততা : দুর্বল অবকাঠামো জেলার মাটি-পানির লবণাক্ততা বিশেষত চরাঞ্চলের মানুষের জীবনকে আক্রান্ত করছে বেশি। গ্রামে খাবার পানির সংকট দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে। কৃষকরা সেচের পানি পাচ্ছে না। পুকুর-জলাশয়ে মাছ চাষ ব্যাহত হচ্ছে।

সবুজ বেষ্টনী উজাড় : জনমানুষের অজ্ঞতা, চোরাচালান, বনদস্যুদের দৌরাত্ম্য, অতিমাত্রায় জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, বাগদা ঘের তৈরী ইত্যাদি কারণে বন বিভাগের সৃষ্টি করা সবুজ বেষ্টনী আজ উজাড় হবার পথে। এটি জেলার জীব-উদ্ভিদ বৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত করছে ও ভূমিক্ষয়, নদী ভাঙনকে বাড়িয়ে তুলছে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : মেঘনা নদীতে অতিরিক্ত মাছ আহরণ মাছের প্রজাতি হ্রাস করছে। মেঘনা মোহনায় মাছের সংকট তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনাকাঙ্ক্ষিত এই জলবায়ুর পরিবর্তন একদিকে যেমন, ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জীবনে "আয়ের নিরাপত্তাহীনতা"কে তীব্রতর করে তুলছে, অন্যদিকে তেমনি নারী মজুরী-শ্রমিক ও গৃহিণীদের "সম্পদ ও নিরাপত্তা"কে সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। অসময়ে বৃষ্টি, অতিবৃষ্টির কারণে নারীরা হাঁস-মুরগির খামার, ভাগে গরু - ছাগল পালন করতে পারে না।

পরিবেশ দূষণ

জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল ও চর এলাকায় পাকা পায়খানার অভাবে নালা-খালের পানি ও বাতাস দূষিত হয়। নিরাপদ পানির অভাবে চরের মানুষ দূষিত পানি পান করে ও পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়। কৃষি জমিতে নিষিদ্ধ সারের ব্যবহার ও চিংড়ি ঘের আশপাশের নালা-খালের পানি দূষিত করছে। এ ছাড়া শহরাঞ্চলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব পরিবেশকে দূষিত করছে।

ইটের ভাটা : লক্ষ্মীপুর জেলায় অর্ধশতাধিক ইট ভাটা রয়েছে। এই ভাটাগুলোতে সরকারি আইন অমান্য করে স্থানীয়ভাবে তৈরি চিমনী ও জ্বালানি হিসেবে কয়লার পরিবর্তে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে জেলার গাছপালা উজারসহ কালো ধোঁয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে।

রায়পুর উপজেলার বামনী ইউনিয়নে পুরনো চিমনি ও কাঠ ব্যবহারের জোরালো অভিযোগ রয়েছে। অথচ, গত ২০০৩ সালে ইট ভাটার অনুকূলে পরিবেশগত সার্টিফিকেট, ছাড়পত্র গ্রহণ ও ৯২০ ফুট উঁচু চিমনী স্থাপনের সরকারি প্রজ্ঞাপন অমান্য করেই নির্বিচারে গাছপালা কেটে ও স্থানীয় চিমনীতে ইট পোড়ানোর কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

ভূমি বন্দোবস্তের সমস্যা

খাস জমি বণ্টন : খাস জমি বন্দোবস্ত, জোতদারদের প্রভাব, চিংড়ি ঘেরের জমি দখল, ঘেরে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংকট দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় ও মাস্তানদের দৌরাত্ম্যে বহু জমি চিংড়ি ঘেরের জন্য লীজ দেয়া হচ্ছে। আশপাশের ধানী জমির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি তোয়াক্কা না করে মাছের ঘেরে লোনা পানি ঢুকিয়ে অবাধে চিংড়ি চাষ হচ্ছে। চরাঞ্চলে খাস জমি বণ্টনে অনিয়ম একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে। জোতদার-ভূমিহীনদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মামলা-মোকদ্দমা চরাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন করে চলেছে।

ভূমি বন্দোবস্ত : খাস জমি বন্দোবস্ত ও ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে সংকট আজ মানবাধিকার সংকটে পরিণত হয়েছে। বছরের পর বছর এই সমস্যা লক্ষ্মীপুরের চরাঞ্চলের দরিদ্র, নিরন্ন মানুষের মানবাধিকার লংঘন করে চলেছে। খাস জমির সংগ্রামে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অপমৃত্যু, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ইতিহাস নতুন নয়। লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলার চর রমণী, চর মোহনা, চর আলী হাসান, উত্তর চর রমণী, চর আঁধার মসিক, কালির চর, চর নূর খাঁতুন, চর কুশাখালী, চর শাহী ও রামগতি উপজেলার চর গজারিয়া, চর কালকিনি, চর ফলকন, চর লক্ষণ, চর রমিজ, চর আবদুল্লাহ, চর আলেকজাণ্ডারে ভূমিহীনরা প্রস্তাবিত জমির বন্দোবস্ত না পেয়ে নানা রকম হয়রানির শিকার হচ্ছে। ভূমি অফিসের অসাধুতা, সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ভূমিবণ্টন নীতিমালা পরিবর্তন, ইউনিয়ন ও উপজেলা ভূমি অফিসের রেকর্ডের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, মামলা নিস্পত্তির সুনির্দিষ্ট সময়সীমার অনুপস্থিতির কারণে চরাঞ্চলে সাধারণ ভূমিহীনরা চরম দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে। এলাকাবাসীর মতে, সরকারের বহুমুখী নিয়ম-কানুন ভূমি বন্দোবস্তের সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলছে।

ভূমিহীনদের পুনর্বাসন : জেলার ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রাম আজ হুমকির সম্মুখীন। উদাহরণস্বরূপ রামগতির ৩নং চর ফলকন ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর চরের কথা বলা যায়। যেখানে ২৮ শত একর জমিতে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটো গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা হয় বিগত সরকারের আমলে। কিন্তু সার্বিক তদারকি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে একটি গুচ্ছগ্রাম আজ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে এবং আরেকটি আংশিক ভাঙনের কবলে পড়েছে। এদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজর দেয়া প্রয়োজন। কেননা গুচ্ছগ্রামের আওতায় নদীভাঙ্গা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তি ও নিশ্চয়তা ফিরে এসেছিল।

সীমানা বিরোধ : প্রতি বছর ধান কাটার মৌসুম ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে লক্ষ্মীপুর জেলার সীমান্তবর্তী চরগুলোতে সীমানা বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভোলার দৌলতখান উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর, চর নলুডঙ্গী, চর গজারিয়ার সাথে লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার চর আবাসের সীমানা বিরোধ দীর্ঘ দিনের। ১৯৭২ সালে গৃহীত সীমানা বিরোধ নিস্পত্তির উদ্যোগটির দীর্ঘসূত্রতার কারণে সহিংসতার সম্ভাবনা রয়ে গেছে। ধান কাটার মৌসুমে চরে চরে হাঙ্গামা, লুটপাট, খুন-খারাবি ও ভূমিসন্ত্রাস মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে ভূমি সন্ত্রাসীদের যোগসাজশ থাকায় এই অপতৎপরতার অবসান ঘটছে না।

কৃষি সমস্যা

লক্ষ্মীপুরের কৃষকরা আজ নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। কৃষি জমির অভাব, জোতদারদের প্রতিপত্তি, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও উন্নত বীজ, সারের অভাব, সেচের জন্য বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরতা জেলার প্রধান কৃষি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত। চরাঞ্চলে ফসল বলতে আমন ধানই প্রধান। আর আমনের পর্যাপ্ত ফলন না হলেই কৃষকরা বিপদে পড়ে যায়।

সার ও কীটনাশকের ব্যবহার : লক্ষ্মীপুর জেলার কৃষকদের অসচেতনতা আর সার ব্যবসায়ীদের অসাধুতার কারণে ইরি ও বোরো ধানের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যাবার আশংকা করা হচ্ছে। প্রতি বছর ইরি, বোরো ধান রোপনের সময় কৃষকরা ট্রিপল সুপার ফসফেট (TSP) সার প্রয়োগ করেন আর এই ব্যাপক চাহিদার মুখে অসাধু সার ব্যবসায়ীরা এফএমপি (FMP) সার বিক্রি করা শুরু করে, যেটির ব্যবহার বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। দুটো সারের বর্ণ প্রায় এক রকম হওয়ায় কৃষকরা এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবনে ব্যর্থ হয়। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলায় এই নিষিদ্ধ সারের ব্যাপক বাজারজাতকরণ হয়েছে। উল্লেখ্য, এই সারের ব্যবহারের ফলে গত রবি মৌসুমে প্রায় ৪৩০০ একর জমির রবি শস্য যেমন, সয়াবিন, মরিচ, চীনাবাদাম, ছোলা'র উৎপাদন আশংকাজনকভাবে ব্যাহত হয়। কৃষকদের আকর্ষণ করার জন্য TSP চলতি বাজার মূল্যের (১৫-১৭ টাকা/কেজি) চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে (১০-১১ টাকা/কেজি) এই (FMP) সার বিক্রি করা হচ্ছে। কোন কোন সময় এই দুটি সার একত্রে মিশিয়ে বিক্রি করা হয়।

চিংড়ি চাষের প্রতিবন্ধকতা : হ্যাচারীতে প্রতি বছর প্রায় ২৭৫০ কেজি রেণু পোনা ও ৩,০০,০০০ চিংড়ি পোনা উৎপাদিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বর্তমানে মাছের উৎপাদন জেলার মাত্র অর্ধেক চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে। চিংড়ি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সরকারি পর্যায়ে কোন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না। আর তাই, চিংড়ি চাষীদের পুঁজির অভাব, উন্নত পোনার সংকট, খাস জমি বন্টন সমস্যা, ব্যাংক ঋণের অভাব, নিরাপত্তাহীনতা আর কৌশলগত জ্ঞান বা প্রশিক্ষণের অভাবে জেলার চিংড়ি চাষ ব্যাহত হচ্ছে। উপজেলা মৎস্য অফিস থেকে পরামর্শ, প্রশিক্ষণ সুবিধা ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়ার কথা থাকলেও উপযুক্ত লোকবলের অভাবের কারণে মৎস্য উন্নয়ন স্কীমের বাস্তবায়ন ব্যর্থ হয়।

কোল্ড স্টোরেজের অভাব : রামগতির মাছের হাটগুলোতে জুন থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত ইলিশ মৌসুমে প্রচুর মাছ নষ্ট হয়। অতিবৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে মাছ দ্রুত চালান দিতে না পারলে মাছের দাম পড়ে যায় এবং জেলেরা মাছের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয়। রামগতিতে বড় একটি কোল্ড স্টোরেজের অভাবে মাছ ব্যবসায়ীরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারছে না।

মেঘনায় জাটকা নিধন : জেলায় বাৎসরিক মাছের চাহিদা পূরণ না হবার পেছনে মেঘনার বুকে জাটকা নিধনের বিষয়টি পরোক্ষভাবে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। নৌ বাহিনীর টহল ফাঁকি দিয়ে লক্ষ্মীপুর ভোলার মেঘনা মোহনায় কারেন্ট জাল দিয়ে অবাধে জাটকা ধরা হচ্ছে। সুলভে কারেন্ট জাল পাওয়ার ফলে জেলেরা সহজেই মোহনায় ইলিশ অভয়ারণ্য বিলীন করে চলেছে। শুধু তাই নয়, মজু চৌধুরী ঘাটের নৌ রুটে ও চ্যানেলে কারেন্ট জাল ফেলায় লঞ্চ, সি ট্রাক, স্টিমার চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

মূলত নির্বিচারে জাটকা নিধনের ফলে সমুদ্র থেকে ইলিশ এ দেশের নদীতে না এসে প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারে চলে যাচ্ছে। এতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে, ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা পূরণে লক্ষ্মীপুরের ইলিশ সম্ভাবনা ব্যর্থ হচ্ছে।

তবে নদীর নাব্যতা হ্রাস, পরিবেশ দূষণ ও নদীর পানিতে ইলিশের খাদ্যের অভাব, প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট হয়ে যাওয়াও কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

খাল খনন : জেলার কৃষিকাজে সেচের পানির অভাব বাড়ছে। জেলার উল্লেখযোগ্য খাল-নালার পূনর্খনন ও সংস্কার না করা এই সংকটকে বাড়িয়ে তুলছে। রামগতির বিস্তীর্ণ এলাকার বৃষ্টির পানি নামত ভুলুয়া খাল দিয়েই। কিন্তু, বর্তমানে বয়ারচরের দক্ষিণ প্রান্তে খালটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টির পানি নেমে যেতে না পেরে বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। তাই, আজ ভুলুয়া খাল লক্ষ্মীপুর ও রামগতির লক্ষ লক্ষ মানুষের দু:খ। উল্লেখ্য, ভুলুয়া খাল সংস্কারের অভাবে লক্ষ্মীপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী পড়ে আছে।

গবাদিপশু সমস্যা : গো-খাদ্য ও চারণভূমির অভাব, কিল্লার অভাব আর চিকিৎসার অভাবে গবাদিপশুর রোগ-বালাই, মৃত্যু, হাঁস-মুরগির মড়ক লেগেই আছে। জেলায় গৃহপালিত পশুর সংখ্যা ক্রমশ কমছে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

দারিদ্র্য : জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, কাজের অভাব ও স্বল্প মজুরী জেলার দারিদ্র্য দশাকে জোরালো করে তুলছে। জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি বর্তমানে জেলার একটি প্রধান সমস্যা বলে বিবেচিত।

মেঘনায় জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য : লক্ষ্মীপুর জেলার মেঘনাঞ্চল আজ অনেকাংশেই জলদস্যুদের নিয়ন্ত্রণে। মাছ ধরা নৌকা বা ট্রলার ডাকাতি, গণলুট, জেলে অপহরণ, মুক্তিপণ ইত্যাদির কারণে লক্ষ্মীপুরের জেলেরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। জলদস্যুদের ভয়ে জেলেরা এখন আর মেঘনা মোহনায় মাছ ধরতে যেতে চায় না। বর্তমানে উপকূল এলাকায় কোস্টগার্ড নিয়োগ অতি জরুরী হয়ে পড়েছে। মেঘনা নদীর উপর জেলা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রন না থাকায় লক্ষ্মীপুরের জেলেদের জীবন আজ চরম সংকটের সম্মুখীন।

চরাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবার অনুপস্থিতি : রামগতি উপজেলার চর গজারিয়ায় হাজার হাজার মানুষ আজ মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। কেননা এখানে কোন সরকারি বা বেসরকারি স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র নেই। চরের দিনমজুর, জেলে ভূমিহীনরা তাই অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও কষ্টের শিকার। অনুন্নত ও দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তারা পার্শ্ববর্তী স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র থেকে সেবা নিতে পারে না। পানীয় জলের সংকটে তাদের দূর-দূরান্ত থেকে পানি সংগ্রহ করে আনতে হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার অভাবে পার্শ্ববর্তী খাল ও নালা ব্যবহারের ফলে তা ক্রমাগত দূষিত হয়ে পড়ছে। আর তাই এখানে গণসচেতনতা বৃদ্ধিসহ স্বাস্থ্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন অবশ্য প্রয়োজন।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য চরাঞ্চলে সন্ত্রাস ও দ্বন্দ্বমূখর সামাজিক পরিবেশ, নারী নির্যাতন, চাঁদাবাজি জেলার আর্থ-সামাজিক পরিবেশ বিপন্ন করে চলেছে। জেলেদের মাছ ধরার ট্রলার ও নৌকা থেকে মাছ, জাল, ডিজেলসহ টাকা পয়সা লুট নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর পর্যাপ্ত টহল না থাকার কারণে মেঘনা মোহনায় বনদস্যুরা সংঘবদ্ধভাবে রামদা, কুড়াল ও লাঠিসোটা নিয়ে জেলেদের উপর ঝাঁপিয়ে পরে। এভাবে জান ও মালের নিরাপত্তার অভাবে লক্ষ্মীপুরের জেলেরা প্রায়ই মাছ না ধরে ঘরে ফিরে আসে। জলদস্যুদের এই অপতৎপরতা প্রত্যক্ষভাবে দেশের রাজস্ব আয় ও জেলেদের জীবিকা নির্বাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উল্লেখ্য, মুক্তিপণের দাবীতে অপহরণ একটি অতি পরিচিত ঘটনা।

লক্ষ্মীপুর জেলার চরাঞ্চল আজ সন্ত্রাস, মাস্তানি আর চাঁদাবাজদের কবলে। চরাঞ্চলের বাড়িঘর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, অপহরণ, ডাকাতি, লাঠিযুদ্ধ ইত্যাদি অতি পরিচিত ঘটনা। চরবাসীরা আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতার কারণে চর এলাকার ভূমিহীন কৃষক, ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলে থেকে শুরু করে পুকুরের ইজারাকারীরা

চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। রামগতি উপজেলার মাছ চাষীরা প্রতিনিয়ত এদের হুমকির শিকার। সন্ত্রাসীদের আক্রমণের মুখে পুকুর ইজারা নিয়েও মাছ চাষ সম্ভব হচ্ছে না।

ঋণ সুবিধা : জেলার প্রত্যন্ত জনপদ ও চরাঞ্চলে সরকারি বেসরকারি ঋণ সুবিধা পর্যাপ্ত নয়। আর তাই, মহাজনি ঋণে অতিরিক্ত বা চড়া সুদ দিতে বাধ্য হচ্ছে জেলার দরিদ্রতম মানুষেরা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারীদের নামে এই ঋণ নেয়া হয় বলে নারীদের উপর ঋণ পরিশোধের চাপ বাড়ছে। চরবাসীরা "দাদন"-এর নীরব শোষণে জর্জরিত। এক শ্রেণীর মুনাফাখোর লোকেরা চরের নিরীহ লোকদের কাছে দাদনে টাকা ছাড়ে। নির্দিষ্ট সময়ে সুদ পরিশোধ করতে না পারলে চক্রবৃদ্ধি সুদ বসানো হয়। এভাবে নদীভাঙ্গা দরিদ্র জনসাধারণ আরো দরিদ্রতর হয়ে পড়ছে।

বন বিভাগ ও ভূমিহীনদের দ্বন্দ্ব : বন বিভাগের উদ্যোগে লক্ষ্মীপুরের চরাঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হয়েছিল। অভিযোগ রয়েছে যে, বন বিভাগ চরের ভূমিহীনদের জমি দখল করে গাছ লাগিয়েছে এবং চরবাসীরা সেই বন কেটে উজাড় করে দিচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের দূরত্ব : চরাঞ্চলে এক দুই কিলোমিটার পর পর ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রগুলো অবস্থিত। এলাকাবাসীর অভিমত অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো চরের মাঝখানে স্থাপন করা গেলে জনসাধারণ বেশি উপকৃত হবে।

বাল্য বিয়ে ও বহু বিয়ে : লক্ষ্মীপুরে চরাঞ্চলে বাল্য বিয়ে ও বহু বিয়ের প্রবণতা রয়েছে। সাধারণত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে চরে বহু বিয়ের ঘটনা ঘটে। একজন লোক অনেক জমি প্রাপ্তির আশায় পর পর কয়েকটি বিয়ে করে। তবে, সামাজিক অসচেতনতা আর অশিক্ষাই বাল্য বিয়ের মূল কারণ। চরের লোকেরা বাড়ন্ত মেয়েদের বিয়ে না হওয়াটাকে ক্ষীণ দৃষ্টিতে দেখে এবং পক্ষান্তরে, অভিভাবকরাও মেয়ে বিয়ে দিয়ে দায়মুক্ত হতে চায়। চরের মানুষদের সচেতন করে তোলা, শিক্ষার বিস্তার, অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে পারলে বাল্য বিয়ে ও বহু বিয়ের ঘটনা অনেক কমে যাবে। উল্লেখ্য, যে সব চরে পর্যাপ্তসংখ্যক শিক্ষা অবকাঠামো যেমন, স্কুল, মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে এর প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম। যৌতুক দেয়ার ভয়ে বাবা মায়েরা তাদের বাড়ন্ত মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। এই মেয়েরা আবার অল্প বয়সে সন্তান জন্ম দিয়ে স্বাস্থ্য সংকট ও সাংসারিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছে।

নারী পাচার : দারিদ্র্য, অসচেতনতা, বাল্য বা বহুবিবাহ, যৌতুক প্রথা, সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর অধ:স্তনতা, দুর্বল প্রশাসন আর সীমান্তরক্ষা বাহিনীর দায়িত্বহীনতার কারণে জেলার দরিদ্রতম নারীরা অর্থ সংস্থানের আশায় প্রতারকদের কবলে পড়ে সীমান্ত পথে পাচার হয়ে যাচ্ছে। কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সীমান্ত রুটে বৃহত্তর নোয়খালী অর্থাৎ লক্ষ্মীপুর জেলার অবহেলিত নারীরা পার্শ্ববর্তী ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

তথ্যশূন্যতা : লক্ষ্মীপুরের দুর্গত বা প্রত্যন্ত চরের মানুষেরা আজ তথ্যশূন্যতায় ডুবে আছে। চর এলাকায় তথ্য প্রবাহ না থাকায় জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা নানা ধরনের দুর্ভোগের শিকার। জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকার মান উন্নয়নে তথ্য শুন্যতা একটি প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আজ যেখানে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে সমগ্র পৃথিবীকে "বিশ্বগ্রাম" বলে ধরে নেয়া হচ্ছে সেখানে লক্ষ্মীপুরের চর বাসীরা তথ্য শূন্যতায় ডুবে আছে, যা জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা।

বিপদাপন্নতা : বিপদাপন্নতা সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৪) অনুযায়ী জেলার প্রধান জীবিকা প্রধানত প্রাকৃতিক, ভৌত ও সামাজিক বিপদাপন্নতার শিকার। এর ফলে জেলে, ক্ষুদ্র কৃষক, চিংড়ি চাষী ও মজুরদের জীবন ও জীবিকায় নিরাপত্তাহীনতা প্রকট হয়ে উঠছে।

যোগাযোগ সমস্যা

অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা : প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট, বন্দর ও নৌঘাটগুলোর অবস্থা শোচনীয়। সংস্কারের অভাব ও মাস্তানদের দৌরাত্ম্যের কারণে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে। মেঘনার তীরে মজুপুর ঘাটে একটি নদী বন্দর স্থাপনের স্বপ্ন বহু দিনের। এক সময় মনে হয়েছিল মেঘনার তীরে নদী বন্দর স্থাপনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি।

মেঘনার নিষিদ্ধ রুটে নৌ-চলাচল : লক্ষ্মীপুর জেলা সীমানায় উত্তাল মেঘনার নিষিদ্ধ রুট অর্থাৎ চর আলেকজাণ্ডার মজু চৌধুরী হাট পর্যন্ত লাল বয়া এলাকায় রুট পারমিট ছাড়াই বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতের লঞ্চ চলাচল চালু থাকে। স্থানীয় প্রভাবশালীদের মদদে নৌপরিবহন আইন উপেক্ষা করে অতিরিক্ত যাত্রীবাহী এই নৌ চলাচলে লঞ্চ ডুবির আশংকা থেকে যায়।

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

উপযুক্ত অবকাঠামোর অভাব : জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহ্য নির্ভর স্থানগুলোতে পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায় হল উপযুক্ত অবকাশ কেন্দ্র ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। পর্যটন শিল্পের বিকাশে পর্যটন গাইডের ভূমিকা অপরিসীম। লক্ষীপুর জেলায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সচেতন পর্যটন গাইড নেই।

মেঘনা মৎস্যজীবী অধিকার রক্ষা সংগ্রাম কমিটি

রামগতিতে ভূমিহীনদের

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে

১ হাজার গাছের চারা বিতরণ

Coast Guard seizes current nets, 'Jatka' fish worth Tk 1 crore

Current-nets worth Tk 20 lakhs burnt at Lakshmipur

ইলিশ! ইলিশ!

লক্ষ্মীপুরের নারিকেল-সুপারির জৌলুস আজ নেই

বরিশাল-ভোলা-লক্ষ্মীপুর মহাসড়ক একটি ফেরি সার্ভিসের

উপকূলীয় জেলাগুলোতে দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প নেয়া হচ্ছে

সম্ভাবনা ও সুযোগ

জেলা ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের জনমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের (২০০৩) মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনউদ্যোগের কয়েকটি সম্ভাবনাময় দিক এখানে আলোচিত হল।

কৃষি ও অর্থনীতি
- ধানক্ষেতে মাছ চাষ
- সমন্বিত কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি
- ঘেরের আইলে সবজি চাষ
- মাছের প্রজনন খামার
- হ্যাচারী
- মৎস্য অভয়ারণ্য
- চিংড়ি চাষ

প্রাকৃতিক সম্পদ
- জলাভূমি
- নদী, মোহনার মাছ
- চরাঞ্চল

আর্থ-সামাজিক
- গুচ্ছ গ্রাম
- মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন
- কমিউনিটি রেডিও
- বাঁধ সংরক্ষণ
- ভূমি ব্যবহার
- জীবনবীমা কার্যক্রম

শিল্প ও বাণিজ্য
- ব্যক্তিখাত
- শিল্পাঞ্চল
- শুঁটকি

পর্যটন শিল্প
- দর্শনীয় স্থান
- প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

যোগাযোগ

কৃষি ও অর্থনীতি

পলি প্রবাহ নিশ্চিত করা, নূতন ও পুরান বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার, খাল খনন ও পুনর্খনন, অবৈধ বাঁধ বা পাটা উচ্ছেদ, পানি ব্যবস্থাপনা ও শক্তিচালিত পাম্প বা Wind mill-এর মাধ্যমে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ইত্যাদি কৃষি নির্ভর অর্থনীতির বিকাশ ও পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করতে আশাবাদী ভূমিকা রাখবে। সেচের পানি, সার বীজ ও কীটনাশক সরবরাহ এবং কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য কৃষিখাতে উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

মাছের প্রজনন খামার : জেলার জলাশয়গুলো সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে। মজে যাওয়া ও পরিত্যক্ত জলাশয় সংস্কার করে মাছের প্রজনন খামারে পরিণত করা সম্ভব। মাছের প্রজনন খামার প্রতিষ্ঠায় যথাযথ প্রশিক্ষণ ও নমুনা প্রদর্শন করে নারী-পুরুষের দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। মাছের পোনা ফোটানোর কাজে লাভের পরিমাণ নিশ্চিত করা গেলে জেলার দরিদ্র নারী-পুরুষের আয়ের সুযোগ বাড়বে।

ধান ও মাছ চাষ পদ্ধতি : লক্ষ্মীপুরে ধানক্ষেতে একই সাথে ধান ও মাছ চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। তাই জেলার কৃষকদের এই সমন্বিত পদ্ধতিতে উৎসাহিত করতে হবে। এই পদ্ধতিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে জৈব সার যেমন, গোবড়, ঘর-গেরস্থালির বর্জ্য ইত্যাদির ব্যবহারে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

সমন্বিত কীট-পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি/Integrated Pest Management : জেলার ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে IPM পদ্ধতিতে একজন কৃষক স্বল্প ও পরিমিত রাসায়নিক সার প্রয়োগের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনে সক্ষম হবে ।

আইলে সবজি চাষ : ধান ক্ষেতে মাছ চাষে যে পরিমাণ পানি থাকা প্রয়োজন তা নিশ্চিত করতে ধান ক্ষেতের চারদিকে উঁচু বাঁধ দিতে হয়। আর এই বাঁধে বিভিন্ন ধরনের মৌসুমী সবজি চাষ করা যায়। মূলত IPM এবং সমন্বিত ধান ক্ষেতে মাছ চাষ পদ্ধতির লাভের পরিমাণকে বাড়িয়ে তোলে এ সবজি চাষ। ফলে, একটি কৃষক পরিবার একই জমি থেকে ধান, মাছ ও সবজির চাহিদা পূরণ করতে পারে। এই পদ্ধতিতে পারিবারিক শ্রমই যথেষ্ট। এটি নারীদের আয়বর্ধক কর্মসূচীর আওতায় পড়ে।

চিংড়ি চাষ : লক্ষ্মীপুর জেলা অচিরেই সাতক্ষীরা জেলার মত চিংড়ি চাষে সাফল্য অর্জন করবে বলে আশা করা যায়। পরিবেশ বান্ধব চিংড়ি চাষের প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন থেকে শুরু করে চিংড়ি

প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকলে মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানী নিশ্চিত করা যাবে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, ফলে জেলার অর্থনীতি জোরদার হবে।

মৎস্য অভয়াশ্রম : প্রাকৃতিক ও মানুষের কারণে জেলার অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়গুলো ক্রমশ মাছশূন্য হয়ে পড়ছে। এই অবস্থা প্রতিরোধে প্রয়োজন আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত মৎস্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম। আর মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠাকে এই জলাশয়গুলোর ব্যবস্থাপনার অন্যতম একটি উপায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। জেলার মাছের সংকট মোকাবিলায় মুক্ত জলাশয়গুলোতে মাছের নিরাপদে বেড়ে ওঠা ও বংশ বিস্তারের স্থান নির্ধারণ করে মৎস্য অভয়াশ্রম গড়ে তোলা যায়।

মহিষ খামার : রামগতি উপজেলা মহিষের দই-এর জন্য বিখ্যাত। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাথান মালিকদের প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা বিশাল মহিষের পাল নিয়ে মহিষ খামার গড়ে তোলা যায়। এতে এটি একটি "কৃষি শিল্পে" পরিণত হবে।

শিল্প ও বাণিজ্য : লক্ষ্মীপুর জেলায় শিল্প ও বাণিজ্যের তেমন কোন বিকাশ ঘটেনি। লক্ষ্মীপুরের একমাত্র বড় শিল্প কারখানা "নোয়াখালী টেক্সটাইল মিল" পুনরায় চালু করা গেলে ও প্রস্তাবিত সার কারখানার বাস্তবায়নে জেলার অর্থনীতি বিকশিত হবে।

প্রাকৃতিক সম্পদ

চরাঞ্চল : জেলার মূল ভূ-খণ্ডের সাথে সংযুক্ত সব ক'টি চরে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষ, চিংড়ি চাষ, কিল্লা ও গো-চারণ ভূমি গঠন ও কৃষির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

নদী ও মোহনার মাছ : লক্ষ্মীপুরের অনন্য সম্পদ মেঘনার ইলিশ। এই ইলিশের প্রাচুর্য্য ধরে রাখতে মেঘনায় জাটকা নিধন, কারেন্ট জালের যথেচ্ছ ব্যবহার ও নদী দূষণ প্রতিরোধ গেলে, জেলেদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়বে ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ইলিশের সরবরাহ নিশ্চিত হবে। জেলেদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে।

উল্লেখ্য, যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমে উপকূলে মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব। উন্নত প্রযুক্তি ও মাছ ধরার শক্তিশালী জেলে নৌকা (লঞ্চ) ঋণের মাধ্যমে জেলেদের দিতে হবে। যার ফলে জেলেরা উপকূলে অফুরন্ত মাছ ধরবে। মোহনার মাছের উপর চাপ কমবে এবং মাছের পোনা রক্ষা পেয়ে মোহনার মাছ উৎপাদন বাড়বে। শুধু তাই নয়, সচেতনতা সৃষ্টিতে জেলেদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

গুচ্ছগ্রাম : গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার বাস্তব ও সময়োচিত উদ্যোগটি পুনরায় চালু হলে নদীভাঙ্গা মানুষ/ ভূমিহীনদের পূনর্বাসন করা সম্ভব হবে। ভূমি বন্দোবস্তের সংকট কমে যাবে।

মৎস্যজীবী গ্রাম সংগঠন : এই সংগঠনের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের সংগঠিত করে তাদের জীবিকার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ক্ষমতায়ন ঘটানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা এবং নদী ও মোহনায় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপায় নিশ্চিত করা যাবে।

গ্রাম কমিটি : ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় পারিবারিক ও সামাজিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে গ্রাম কমিটি গঠন করে দুর্যোগের আগে, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে পরিকল্পিতভাবে দুর্যোগ মোকাবিলা করা ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, এনজিও, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয় সাধন সম্ভব হবে। এই গ্রাম কমিটি বিপদ

সংকেত (৫,৬,৭) পাওয়া মাত্রই প্রচার কাজ শুরু করার দায়িত্বে থাকবে। ফলে, মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিতে পারবে এবং বিপদের আগেই তারা গবাদি পশু, ঘর-গেরস্থালির দ্রব্য সামগ্রী, মাছ ধরার সরঞ্জাম, নৌকা ইত্যাদি নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে রক্ষা করতে পারবে।

কমিউনিটি রেডিও : লক্ষ্মীপুরের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণমানুষের মাধ্যম হিসেবে কমিউনিটি রেডিও এক সম্ভাবনাময় গণমাধ্যমে পরিণত হতে পারে। কেননা এর ফলে স্থানীয় জনসাধারণ তথ্য ও বিনোদনের সুযোগ নিজস্ব ভাষায় সহজ করে তুলে ধরতে পারবে। নিজ এলাকার উন্নয়নে সমস্যা ও তার যৌক্তিক সমাধান, জনসচেতনতা সৃষ্টি, উদ্বুদ্ধকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে। এ ছাড়া এটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংকেত, পূর্ব প্রস্তুতি, জানমালের নিরাপত্তা দিতে সাহায্য করবে। নিজ এলাকার আর্থ-সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে, দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিরসনে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় ও জবাবদিহিতা প্রভৃতি বিষয়ে স্থানীয় মতামত তুলে ধরবে এবং স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

বাঁধ সংরক্ষণ : বাঁধ সংরক্ষণে বাস্তব, সময়োচিত উদ্যোগ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ভাঙনরোধ, লোনাজলের প্রবেশ গতিরোধ, ফসল রক্ষা, শহর ও গ্রামাঞ্চল রক্ষায় সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতা থাকা প্রয়োজন।

ভূমি ব্যবহার : স্থানীয় জনসাধারণের অংশগ্রহণে জেলার ভূমি ব্যবহারের পরিকল্পনা তৈরি করা গেলে করে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

জীবনবীমা কার্যক্রম : জেলেদের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জীবনবীমা কার্যক্রম করা যেতে পারে। এর ফলে, তাদের সচেতনতা সৃষ্টিসহ সঠিক উপায়ে পরিমিত পরিমাণে মৎস্য সম্পদ আহরণের পথ প্রশস্ত হবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা : যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করলে জনসাধারণের যোগাযোগের সমস্যা দূর হবে ও সার্বিকভাবে মানবসম্পদের উন্নয়ন সম্ভব হবে। জেলার জনসাধারণের জান-মালের রক্ষা ও নৌ শৃঙ্খলার জন্য রুট পারমিটবিহীন নৌযান অবৈধ ঘোষণা করা দরকার।

জনসচেতনতা : লক্ষ্মীপুরের জনমানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধে সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি ব্যক্তিখাতসহ গণমাধ্যমের প্রচারণা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন। নিরাপদ পানির সুবিধা নিশ্চিত করতে ভূ-উপরিস্থিত পানির বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ও ব্যবহার সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলা দরকার।

শিল্প ও বাণিজ্য

ব্যক্তিখাত : জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তিখাতের কার্যকলাপ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানীসহ পর্যটন শিল্পে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ জেলার অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করবে।

শিল্পাঞ্চল : প্রতিটি উপজেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে।

শুঁটকি : যথাযথ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এই জেলায় শুঁটকি শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব এবং এ থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনাও প্রবল। চরাঞ্চলে স্বল্প দামের "সোলার টানেল ড্রায়ার" পদ্ধতিতে পুষ্টি ও গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের শুঁটকি তৈরি করা সম্ভব।

নৌ/নদী বন্দর : নদী বন্দর বা ঘাটের সংখ্যা বাড়ানো হলে জেলার উৎপাদিত বা আহরিত কৃষিপণ্য বাজারজাত করার সুবিধা বাড়বে এবং তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ঘুচবে।

পর্যটন শিল্প

দর্শনীয় স্থান : জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে। ঐতিহ্য নির্ভর এই স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে জেলায় পর্যটন আকর্ষণ গড়ে তোলা সম্ভব। সরকারি ও বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে পর্যটন শিল্প বিকশিত হবে। জেলার দর্শনীয় স্থানগুলোতে পর্যাপ্তসংখ্যক হোটেল বা অবকাশযাপন কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত "পর্যটন গাইড" নিয়োগ করা প্রয়োজন। এতে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের সমাগম হবে এবং আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যাবে।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন : জেলার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে ঘিরে পর্যটন কর্মসূচী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। কেননা জেলা সৃষ্টির শুরু থেকেই এটি নানা শাসক ও রাজ্যের অধীনে থাকার কারণে এর পুরাতাত্ত্বিক ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণময়। আর তাই ঐতিহাসিক স্থান ও পুরাকীর্তিগুলোর প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যও অপরিসীম।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

নদী বন্দর : মেঘনার তীরে মজুপুর ঘাটে নদী বন্দর স্থাপিত হলে ও নদী বন্দরগুলোর উন্নয়নের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াতের উন্নয়ন ও আঞ্চলিক দূরত্ব কমে যাবে ও শিল্পায়নের বিকাশ ঘটবে।

নদ-নদীর নাব্যতা : জোয়ার-ভাটার নদীগুলোর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা দরকার। এতে নদী ভাঙন প্রতিরোধ, মরা নদী পুনরুদ্ধার, পলি নিয়ন্ত্রন ও নদী শাসন সমস্যার অবসান হবে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

বর্তমান জনসংখ্যা ১৪ লাখ ৮৬ হাজার থেকে আগামী ২০১৫ সালে হতে পারে ১৭ লাখ ৪৯ হাজার এবং ২০৫০ সালে ২৩ লাখ ৯৩ হাজার। মাত্র ১৫ বছরে লোক সংখ্যা বাড়তে পারে ২ লাখ ৬৩ হাজার । ২০১৫ সালে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর। জেলার জনসংখ্যার ৫১.১৪% পুরুষ এবং ৪৯.৮৬ নারী আর ৮৫% গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ১৫% শহুরে জনগোষ্ঠী ।

এই বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানান পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায় তা হলো, কৃষি, মাছ উৎপাদন, চিংড়ি উৎপাদন, পর্যটন সম্ভাবনা ইত্যাদি। অন্যদিকে যে সমস্ত বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেয়া দরকার তা হল ভূমি বন্দোবস্ত, কৃষি উন্নয়ন, আর্সেনিক সংকট, চরাঞ্চল, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি।

লক্ষ্মীপুরের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরাপদ পানি সুবিধা নিশ্চিত করতে স্বল্প মূল্যের আর্সেনিক প্রতিরোধ কৌশল, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, স্বল্প সুদে পানি বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি ও দুর্গত এলাকায় পাইপ লাইনে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ সহায়ক হবে।

কৃষকদের কৃষি ঋণ, কৃষি উপকরণ, কৃষি প্রশিক্ষণ, সমন্বিত ধান মাছ চাষ পদ্ধতির প্রসার, নারী-পুরুষদের IPM পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ, কৃষিপণ্য বাজারজাত ও গুদামজাতকরণ নিশ্চিত করাসহ চরাঞ্চলে ও জেলার প্রত্যন্ত জনপদের জলাবদ্ধতা দূর করে একফসলী জমিগুলোকে দুই বা তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরের মাধ্যমে জেলার কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

ভূমি বন্দোবস্তের সমস্যা রোধে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসন, স্থানীয় এমপি, স্থানীয় কলেজের একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক, স্থানীয় চেয়ারম্যান, প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্য সমন্বয়ে গঠিত সার্বিক তদন্ত ও ভূমি বন্দোবস্ত কমিটি গঠন করে বছরের পর বছর নথি না ফেলে রেখে দ্রুত জমি বন্দোবস্ত দেয়ার কাজটি করতে পারলে খাস জমি বন্দোবস্তের বিষয়টি সহজ হবে।

এ ছাড়া জেলার ৪টি উপজেলায় ৪টি শিল্পাঞ্চল করা যেতে পারে। শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জেলায় প্রাপ্ত কাঁচামাল যেমন, মাছ, কাঠ, অন্যান্য সামুদ্রিক কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে, রাস্তা-ঘাট, বন্দর, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। স্থানীয় বাজারকে লক্ষ্য রেখে এখানে শিল্পাঞ্চল স্থাপন করা যেতে পারে এবং উপজেলার প্রবাসী ব্যক্তিবর্গকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব। উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীগণ একদিকে যেমন বিনিয়োগ করতে পারবে অন্যদিকে প্রবাসে থাকার কারণে রপ্তানীতে ভূমিকা রাখতে পারবে। বস্তুত, সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এই উদ্যোগ জেলার অর্থনীতিতে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।

দর্শনীয় স্থান

লক্ষ্মীপুরের আনাচে-কানাচে ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। যথাযথ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এ সব প্রাচীন শিল্প ও স্থাপত্যের পর্যটন মূল্য বাড়ানো সম্ভব। আর এর জন্য প্রয়োজন জনসচেতনতা সৃষ্টি ও সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা।

রামগতি : রামগতি বাজারের দক্ষিণে মেঘনা নদী বঙ্গোপসাগরে পড়েছে, যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং দেখতে অনেকটা প্রাকৃতিক সমুদ্র সৈকতের মত। একজন পর্যটক রামগতিতে মেঘনার বুকে জেলেদের ইলিশ মাছ ধরার অনাবিল সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, নদীর বুকে নৌকার সারি আর কেয়া গাছের সবুজ বেষ্টনীর অপরূপ শোভা রামগতির বৈশিষ্ট্যে বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। রামগতি ঐতিহ্যবাহী মহিষের দই ও মিষ্টির জন্য বিখ্যাত।

ঐতিহ্যবাহী দালাল বাড়ী : লক্ষ্মীপুর জেলা সদর থেকে ৫ কি.মি. পশ্চিমে রায়পুর-ঢাকা মহাসড়কের পাশে দালাল বাজারে প্রায় ৫ একর জমির উপর ঐতিহ্যবাহী দালাল বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে। ঐতিহ্য মতে, আজ থেকে ৪০০ বছর আগে ভুলুয়া রাজ্যাধীন লক্ষ্মীপুর পরগনাতে গৌর বংশের কিছু লোক যুগি/কাপড়ের ব্যবসার প্রসার ঘটায়। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি এখানে বাণিজ্য ঘাঁটি গড়ে তুললে গৌর বংশের লোকেরা তাদের এজেন্ট হিসেবে সুবিধা পায়। আর সেই সুবাদে জনৈক গৌরি কিশোর রায় চৌধুরী দালাল বাজারে ব্যবসা কেন্দ্র স্থাপন করে এবং তার ছেলে নলিনী কিশোর রায় চৌধুরী জমিদারিত্ব ক্রয় করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই জমিদার বাড়ীটি দালাল বাড়ী নামে পরিচিত হয়। ১৯৪৭-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরে তার বংশধরেরা সম্পদ ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে কলকাতায় চলে যায় এবং চরে তাদের সম্পত্তি সরকারি খাস জমির অন্তর্ভুক্ত হয়। বিশাল এই জমিদার বাড়ীর রাজগেটের ভেতরে একাধারে রাজ প্রাসাদ ও জমিদার প্রাসাদ, অন্দর মহল প্রাসাদ, অন্দর কুয়া, শান বাঁধানো ঘাট, পুকুর ও পূজামণ্ডপ রয়েছে।

কামান খোলা বাবুর বাড়ী : আজ থেকে প্রায় ৩০০ বছর আগে তৎকালীন ভুলুয়ার জমিদারী থেকে জনৈক লক্ষ্মীনারায়ণ ভূঞা জমিদারী বন্দোবস্ত নেন এবং একই সাথে দালাল বাড়ীর অর্ধেক জমিদারী কিনে নিয়ে এখানেই বসতি স্থাপন করেন। এটিই কামান খোলার জমিদার বাড়ী নামে পরিচিত। জমিদার লক্ষ্মী নারায়ণের পৌত্র যদুনাথের পালিত ছেলে (বাবু হরেন্দ নাথ)-র ঘরের নাতী দুলাল বাবু বর্তমানে দেবত্ত সম্পদের মালিকানা নিয়ে ধবংসাবশেষের মধ্যে অবস্থান করছেন। বাড়ীর সদর দরজায় কাল পাড়ের লাঠিয়াল ও রক্ষীবাহিনীর প্রাসাদ, রক্ষীবাহিনীর আবাস ও পূজামণ্ডপ নিয়ে গঠিত প্রাসাদ ও ভেতর বাড়ীর প্রাসাদ ভবন এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এই ভেতর বাড়ীর রাজ প্রাসাদে ভূ-গর্ভস্থ নৃত্যশালা ও সালিশ কক্ষ বা "আধার মানিক" নামের কক্ষটিতে গুপ্তধন রয়েছে বলে লোকে বিশ্বাস করে। ১৩৫২ সালে হরেন্দ্র বাবুর মৃত্যু শেষে তার প্রিয় পোষা হাতিটিও মারা যায়। আর সেই হাতির হাঁড় এখনো এই প্রাসাদে সংরক্ষিত আছে।

সাহেববাড়ী বা নীলকুঠি : ১৭শ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজরা তৎকালীন বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় নীল উৎপাদন শুরু করে। তারা লক্ষ্মীপুরের বাঞ্চানগর বাঘ বাড়ীর পেছনে স্থায়ী কুঠি স্থাপন করে নীলকর উঠানো শুরু করে। ১৯৩০ সালে নীলকরেরা ব্যাংক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে জনৈক হিন্দু ডাক্তারের কাছে বাড়ীটি বিক্রি করে দেয়। জনশ্রুতি মতে, এই ডাক্তার সারা বাংলার দুইজন বিখ্যাত আকুপাংচার বিশেষজ্ঞের একজন ছিলেন এবং তিনি স্ব-

উদ্যোগে সেই কুঠিতে একটি ল্যাবরেটরি ও হাসপাতাল গড়ে তোলেন। ডাক্তারী যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ আলমিরাটি আজও সেই স্মৃতি বহন করে চলেছে।

জ্বীনের মসজিদ : আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে দিল্লীর জামে মসজিদের আদলে লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে জ্বীনের মসজিদ স্থাপিত হয়। নদী ভাঙনে সর্বস্ব হারিয়ে নোয়াখালীর সুধারাম থানা থেকে জনৈক মুন্সী রহমতউল্ল্যাহ তালুকদার রায়পুরে বসতি স্থাপন করেন। তারই ছেলে আব্দুল্লাহ (রা:) দেওবন্দ মাদ্রাসায় লেখাপড়া শেষ করে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করেন। কালক্রমে বুজুর্গ লোক হিসেবে সুখ্যাতি অর্জনকারী এই ব্যক্তির পুত্র মোহাম্মদ সাহেবও দেওবন্দে লেখাপড়া শেষ করে পিতার প্ররোচনায় মসজিদটি নির্মাণ করেন। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ইট তৈরি, মসজিদ নির্মাণ, বড় দীঘি ও দক্ষিণের দীঘি খননের বিষয়টি জনমনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এবং মসজিদটি জ্বীনের তৈরি বলে বিশ্বাস করে। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত মসজিদের দক্ষিণ অংশে মাটির নীচে একটি কুঠুরী আছে। অতি পুরনো ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য কলায় নির্মিত এই মসজিদটির পর্যটন মূল্য অপরিসীম।

ধোলাকান্দি জামে মসজিদ : তৎকালীন ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত মাওলানা ইমামউদ্দীন (রা:) বাঙালী সাহেব ১৮৩২ সালে লক্ষ্মীপুরের ৭ নং বাঙা খাঁ ইউনিয়নের ধোলাকান্দি গ্রামে এই জামে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মসজিদটি প্রাচীন স্থাপত্য কলার নির্দশন সম্পন্ন ও ১৬৬ বছরের পুরানো।

রায়পুর বড় জামে মসজিদ : ১২১৭ সালে হযরত শাহ্ ফজলুল্লাহ রায়পুর উপজেলায় রায়পুর জামে মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি মতে, কোন এক সময়ে তার পূর্বপুরুষরা সন্দ্বীপের দিললে রাজার সাথে বাগদাদ থেকে সন্দ্বীপে আসেন এবং ১২০০ সালের দিকে শাহ ফজলুল্লাহ রায়পুরে বসতি স্থাপন করেন। জনসাধারণের অনুরোধে কোরআন-হাদিসের শিক্ষা দেবার জন্য তিনি রায়পুরে থেকে যান। একটি খড়ের ঘর থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তিনি এই ঐতিহাসিক ২৩ গম্বুজ মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে একত্রে ৫০০ জন মুসল্লী নামাজ আদায়ে সক্ষম। জেলার ধর্ম প্রসারের ইতিহাস নির্ভর এই মসজিদটির প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

মান্দারী বাজার বড় জামে মসজিদ : আজ থেকে ১১০ বছর পূর্বে মুন্সী হাসমত উল্ল্যাহর উদ্যোগে লক্ষ্মীপুরের মান্দারী বাজারে এই জামে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদটির নির্মাণ-শৈলী অর্থাৎ সুউচ্চ মিনার ও মনোরম পরিবেশে আকৃষ্ট হয়ে সারা বছর ধরে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এটি দেখতে আসে।

হযরত মিরান শাহ (রা:) সাহেবের মাজার : লক্ষ্মীপুর জেলার রামগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চনপুর গ্রামে মিরান শাহ-এর মাজার অবস্থিত, যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন ভক্তরা মাজার জিয়ারতের জন্য আসেন। বাগগাদের বড় পীর হযরত সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রা:)-র পুত্র হযরত মাওলানা সৈয়দ আজাল্লা (রা:)-র ঘরেই দিল্লীতে সৈয়দ হাফেজ মাওলানা আহমদ আমুরী তাওয়াকেল্লী বা হযরত মিরান শাহের জন্ম। তিনিই পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজধানী পাণ্ডুয়া হয়ে সিলেটে আগমন করেন। তারপর ঢাকা হয়ে নোয়াখালী অঞ্চলে আসেন এবং সাথে ছিল তার বোন বিবি মজযুবাসহ আরো ১২ জন সুফী সাকি। ইসলাম ধর্ম প্রচারের সময় তিনি অনেকভাবেই বাঁধাগ্রস্ত হন। কিন্তু নিজ আধ্যাত্মিক শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতাবলে তিনি সে সব উতরে যান। সমগ্র নোয়াখালী অঞ্চলে এই ভাই বোনের মাজারের প্রতি জনগণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রয়েছে। এই মাজারে বহু লোকের মনবাসনা পূর্ণ হয়েছে অর্থাৎ মাজারটি আধ্যাত্মিকভাবে বিখ্যাত।

শামপুর দায়রা শরীফ : ১২২২ সালে রামগঞ্জ উপজেলার শামপুরে শাহ্ সুফী সৈয়দ জকিউদ্দীন আল হোছাইনী আল কাদেরী আল চিশতী (রা:) শামপুর দায়রা শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বছর (বাংলা) মাঘ মাসের দ্বিতীয়

শুক্রবার তার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ছয় দিনব্যাপী ওরশ মোবারক অনুষ্ঠিত হয় ও এতে দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। এটি লক্ষ্মীপুরের একটি উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থানে পরিণত হয়েছে।

রামগতির হাট দায়রা শরীফ : আঠার শতাব্দীর শেষার্ধে সন্দ্বীপের সুফী সাধক হযরত চাঁদ শাহ্ ফকির চর মেহের বা রামগতিতে এই দায়রা শরীফ প্রতিষ্ঠা করেন। এই চাঁদ শাহের পূর্ব পুরুষরা দশম শতাব্দীর পরে আরব থেকে সন্দ্বীপে আসেন। রামগতির একটি ঐতিহাসিক ও পবিত্র স্থান বলে পরিচিত এই দায়রা শরীফে লক্ষ্মীপুর জেলাবাসী যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে মুক্তির আশায় দোয়া/প্রার্থনা করতে ছুটে আসেন।

এ ছাড়া রায়পুরে মুসলিম সভ্যতার গোড়াপত্তনকারী পীর হযরত মাওলানা ফজলুল হক বাগদাদী (রা:) ও তার সুযোগ্য পূত্র পীর হযরত মাওলানা বড় মিয়া সাহেব (রা:) -এর মাজার জেলার প্রসিদ্ধ একটি স্থান।